শৈল-ভবন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক :

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :—
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রকাশক :
মিনতি সেন গুপ্তা
১৬৬/সি/৪২৬ লেক গার্ডেনস্
কলিকাতা-৭০০০৪৫

মুদ্রাকর :
গোবিন্দ লাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২নং ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম কুণ্ডু

উপদেষ্টা :
স্বাতী গাঙ্গুলী

পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৩

শৈল-ভবন

অভিজাতক

বোম্বাই শহর বড়মানুষের শহর। সেখানে পথে পথে নয়তলা দশতলা বাড়ি উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে; মালাবার হিল্-এর প্রাসাদগুলি উচ্চ আসনে বসে আপন আপন গৌরব-গরিমা ঘোষণা করছে; আবার তারই আশেপাশে চৌল আছে, যেখানে হীনজীবী মানুষ খোপের পায়রার মতন একটি কুঠরি নিয়ে বাস করছে; অন্ধ গলির মধ্যে বস্তির অধিবাসীরা নিজেদের উলঙ্গ দীনতা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

একটা স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। দরজার ছু'পাশে সুরকি-খসা দেয়ালের জরাজীর্ণ নগ্নতা, রং-চটা দরজার কাঠের ওপর কাঁচা হাতে খড়ি দিয়ে লেখা—লোকনাথ সিংহ।

এই বাড়ির একটি ঘরে কেঠো তক্তপোষ ছাড়া আসবাব বলতে আর কিছু নেই। বালিশে পিঠ রেখে লোকনাথ বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে খক্ খক্ করে কাশছে। তার স্ত্রী কুসুম পিছন দিক থেকে স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে এমন ভাবে তাকে ধরে আছে যাতে সে কাশির বেগ সামলাতে পারে। লোকনাথের বয়স আন্দাজ ছত্রিশ, শরীর রোগ-জীর্ণ, সারা দেহে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

কাশির বেগ একটু কমলে কুসুম স্বামীকে একগ্লাস জল এনে দিল, তার জল খাওয়া হলে আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। লোকনাথ শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে ক্ষীণস্বরে বলল,—'শুনেছি জলে ডুবে মরার আগে মানুষ অতীত জীবনের ঘটনা ছবির মত দেখতে পায়। আমিও যেন আজ ঠিক সেই রকম দেখতে পাচ্ছি—'

কুসুম ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল,—'ওগো অমন করে বোল না, চুপ কর।'

তার কথায় কান না দিয়ে লোকনাথ আপন মনেই বলে চলল,—'ওই ছবিটা দেখলেই একটি দিনের কথা মনে পড়ে. বাবার সঙ্গে সেদিন—'

দেয়ালে একটি পুরনো ফটো—কম্পাউণ্ড-ঘেরা বড় বাড়ি, জমিদারের বাড়ি যেমন হয়, চারদিকে সুন্দর বাগান, বাগানের এক কোণে ফোয়ারা থেকে জল উৎসারিত হচ্ছে।

ফটোর দিকে চেয়ে লোকনাথ বলে চলেছে—'ওই ফোয়ারা দেখছ, বাবার সঙ্গে সেদিন ওরই কাছে বসে দাবা খেলছিলাম। দাবা খেলায় বাবার কী ভীষণ নেশা ছিল—'

স্মৃতির আলোয় দৃশ্যটি উজ্জীবিত হল। ফোয়ারার কাছে ছোট টেবিলের দু'পাশে বসে পিতাপুত্রের দাবা-খেলা চলছে। দুজনেই খেলায় তন্ময়। বিশ বছরের যুবক লোকনাথ ; একনাথের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চুলে পাক ধরেছে. মুখ দেখেই বোঝা যায় গর্বিত কঠোর প্রকৃতির মানুষ, খেলার সময়েও তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নরম হয় না। তিনি পরাজয়ে অভ্যস্ত নন।

কয়েকবার চাল দেবার পর লোকনাথ মুচকি হেসে দান দিল, সহজ সুরে বলল,—'কিস্তি। বাবা আপনি মাৎ হয়ে গেলেন'

একনাথ ব্যগ্র বিস্ময়ে ছকের দিকে চেয়ে রইলেন। না, কোন সন্দেহ নেই, তিনি মাৎ হয়ে গেছেন। রাজার পালাবার রাস্তা নেই। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, —'আরে তাই তো, এটা কি রকম হল।' ছেলের দিকে ব্যর্থ চোখ তুলে তিনি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ওহে ডাক্তার, এ কি কাণ্ড!'

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার পাণ্ডে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, একনাথের আহ্বানে কাছে এসে দাঁড়ালেন। ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ. বুদ্ধিমান ও রসিক ; বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ।

একনাথের গলায় গর্ব এবং নৈরাশ্য একসঙ্গে ফুটে উঠল,—'ত্থাখো ডাক্তার, কাণ্ডটা ত্থাখো। একটা কলেজের ছেলে কিনা আমায় মাৎ করে দিলে—'

লোকনাথ সসম্ভ্রমে উঠে নিজের চেয়ার ডাক্তারে দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, তিনি হাসতে হাসতে লোকনাথের পিঠে চাপড় মেরে বললেন,—'বাবুজি, আমাদের যৌবন ফুরিয়ে এল, এখন আমাদের হারের পালা। বিজ্ঞান বলে—'

'আরে রেখে দাও তোমার বিজ্ঞান। এ হচ্ছে বংশের ধারা। ছ্যাকৃড়া গাড়ির ঘোড়া কি রেসের বাজি জিততে পারে!'

ডাক্তার পাশে চেয়ারে বসে তর্ক জুড়লেন,—'তা হয়তো পারে না, কিন্তু রেসের ঘোড়ার কুলুজি ঘাঁটলে দেখা যাবে গোড়ার কেউ না কেউ ছাকৃড়া গাড়িই টানত।'

একনাথ হুঙ্কার দিলেন,—'অসম্ভব। হতেই পারে না। রেসের ঘোড়ার বাচ্চাই রেসের ঘোড়া হয়। লোকনাথ, ঠিক কিনা?'

লোকনাথ ঘাড় হেঁট করে রইল। একনাথ তখন বললেন,—'তুমি আজ প্রমাণ করেছ বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়। আমি খুশী হয়েছি। কি প্রাইজ চাই বল?'

'প্রাইজ!' একটি প্রাইজের জন্যে তার মনে প্রবল লুব্ধতা ছিল, কিন্তু প্রবলপ্রতাপ বাপের সামনে সে-কথা উচ্চারণ করার সাহস হয় নি। এখন প্রাইজের কথা শুনে তার মুখ অরুণাভ হয়ে উঠল, সে একবার বাপের দিকে একবার ডাক্তারের দিকে চাইতে চাইতে মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। শেষে দাবার ঘুঁটি নাড়াচাড়া করতে করতে জড়ানো গলায় বলল,—'প্রাইজ দেবেন? এঁ—'

একনাথ সাহস দিয়ে বললেন,—'বল, লজ্জা কি। কী নেবে—আরবী ঘোড়া, না হাল-ফ্যাশনের মোটরগাড়ি?'

লোকনাথ আশান্বিত স্বরে বলল,—'যা চাইব তাই দেবেন?'

একনাথ হাসলেন,—'যদি আমার সাধ্যে কুলোয়।'

লোকনাথ তখন লজ্জা-গদ্গদ্ কণ্ঠে বলল,—'বাবা, একটি মেয়ে আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

নিমেষে একনাথের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি ভ্রূকুটি করে লোকনাথের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কড়া সুরে বললেন,—'মেয়ে?

কার মেয়ে ?'

এখন আর পিছনো যায় না, লোকনাথ যথাসম্ভব ধীরভাবে বলল, —স্কুল-মাস্টারের মেয়ে, লখ্‌নৌতে বাড়ি। আমাদের বোর্ডিংয়ের কাছে বাসা ছিল।'

একনাথ অবিশ্বাসের সুরে বললেন,—'স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাও ?'

লোকনাথ বলল,—'তাতে দোষ কি ? ভিন্ জাতের মেয়ে তো নয়, ওরাও রাজপুত।'

ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে একনাথ বললেন,—'তাহলেই হল ? শ্যাখো হে ডাক্তার, আজকালকার ছেলেরা দু'পাতা ইংরিজি পড়ে কি শিখেছে।'

একগুঁয়েমির বংশগত গরম লোকনাথের মাথায় চড়তে আরম্ভ করেছিল, ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বলল,—'ইংরিজি পড়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ দেখতে পাচ্ছি না।'

একনাথের দৃষ্টি আরো কঠিন হয়ে উঠল,—'চোখ থাকলে তো দেখবে। শোনো, আগে বংশের প্রতি কর্তব্য, তারপর অন্য কথা। স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না, সমান ঘরে বিয়ে করতে হবে। আমার কাছে বংশমর্যাদাই প্রধান।'

'কিন্তু—'

একনাথ গর্জন করে উঠলেন,—'ব্যস্, অনেক শুনেছি, আর না! আমি এ-বাড়ির মালিক, আমার কথা সবাইকে মেনে চলতে হবে। আমি যার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির করব তাকেই বিয়ে করতে হবে। এই আমার শেষ কথা।' হাতের এক ঝট্‌কায় তিনি দাবার ঘুঁটিগুলো টেবিল থেকে নীচে ফেলে দিলেন, যেন এই ভাবেই উদ্যত বিদ্রোহকে ধূলিসাৎ করলেন।

লোকনাথ আর কোন কথা বলল না, কিন্তু তার মনের বিদ্রোহ মুখের ওপর প্রতিবিম্বিত হল। ডাক্তার পাণ্ডে এই পারিবারিক অগ্ন্যুদ্গারের সামনে পক্ষাহতের মত বসে রইলেন।

রোগপাণ্ডুর লোকনাথ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে কুসুমকে কাছে টেনে নিল, আপন মনে বলে চলল,—'আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না, শুধু জানতাম কুসুমকে না পেলে আমি বাঁচব না। কাউকে না জানিয়ে তাকে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে এলাম—'

বর-বধূ বেশে লোকনাথ ও কুসুম বাগানের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে আসছে।

বাড়ির বারান্দায় একনাথ অগ্নিস্তম্ভের মত জ্বলছেন, মুহূর্তে একটা বিপর্যয় হতে পারে। চারিদিকে থমথমে ভাব। কিছু দূরে ডাক্তার পাণ্ডে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

বর-বধূ বারান্দার সিঁড়ির কাছে আসতেই একনাথ বজ্রের মত গর্জে উঠলেন—'এত সাহস তোমার! ওই মেয়েকেই বিয়ে করেছ! তবে আমার কাছে এসেছ কেন? যাও, এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই নেই, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আজ থেকে তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র।'

পাণ্ডে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন,—'বাবুসাহেব, এ আপনি কি করলেন! আপনার একমাত্র সন্তান—'

'আমার সন্তান নেই। যাও, দূর হয়ে যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

লোকনাথ স্থিরদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল,—'তাই যাচ্ছি বাবা। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি—আপনি ডেকে না পাঠালে কোনদিন ফিরে আসব না।'

জোড়হাতে নত হয়ে সে বাপকে প্রণাম করল, তারপর কুসুমের হাত ধরে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে চলে গেল।

বাড়ির ঝি-চাকরেরা এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখের জল মুছতে লাগল। বাড়ির পুরোহিতমশাই বারান্দার এক কোণ থেকে সব দেখছিলেন, তিনি আর্দ্র চোখে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। একনাথ পরিজনদের

দিকে ফিরে উগ্রস্বরে বললেন,—'তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, আমার ছেলের সঙ্গে যদি কেউ সম্পর্ক রাখো, তাকেও দূর করে দেব। ওর নাম এ বাড়িতে কেউ উচ্চারণ করবে না।'

লোকনাথ বিছানায় বসে আছে, কুসুম তার পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে অতীতের দুঃস্বপ্ন দেখছে।

লোকনাথ বলছে,- '···পনেরো বছর কেটে গেল, মনে হয় যেন সেদিনের কথা। এর মধ্যে কত ওলট-পালট হয়ে গেছে। সোমনাথ জন্মাল···বড় হয়ে উঠল···আর আমি দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি ·· অভাব···রোগ···আমার দিন ফুরিয়ে আসছে—'

'ওগো চুপ কর।'

'তুমি যদি মনে কষ্ট পাও বলব না। কিন্তু মনকে তৈরি রাখাই ভাল। সোমনাথ কখন ফিরবে?'

'তার স্কুলের ছুটি হয় চারটেয়, আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। তাকে কোন দরকার আছে?'

'তার সঙ্গে এক দান দাবা খেলতাম···হয়তো আর খেলা হবে না। দাবার ছক আর ঘুঁটি এনে রাখ তো।' বলতে বলতে দমকা কাশির বেগে সে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময় বাড়ির বাইরে নোংরা সরু গলি দিয়ে ডাক্তার পাণ্ডে চলেছিলেন। বয়সের ভারে তাঁর গতি মন্থর, হাতে একটি খোলা নোট-বুক, বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যাচ্ছেন।

ঘরের মধ্যে তখন লোকনাথ বিছানার ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে-

'···ডাক্তার পাণ্ডে বলতেন,- দাবা আর অহঙ্কার এই দুটো আমাদের, মানে পুরন্দরপুরের সিংহদের আসল রোগ। ডাক্তার পাণ্ডেকে তুমি চেনো না, অতি সজ্জন, আমাদের বাড়ির ডাক্তার, তাঁকে চাচা বলে ডাকতাম। জানি না তিনি আছেন কিনা—'

বাইরে ডাক্তার পাণ্ডে দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা নাম পড়ে থমকে

দাঁড়িয়ে ছিলেন, নোট-বুকে নম্বর মিলিয়ে দরজার কাছে এসে বিষাদ-ভরা বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন একটা জীর্ণ নোংরা বাড়িতে লোকনাথ থাকতে পারে। তিনি দরজায় টোকা দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁর পায়ের কাছে একটি ঘুরন্ত লাট্টু এসে ঘুরতে লাগল। ডাক্তার পাণ্ডে ফিরে দেখলেন একটি ছেলে, বয়স আন্দাজ চোদ্দ, বুদ্ধিতে জ্বল জ্বল করছে মুখ, পরনে প্যান্ট ও হাফশার্ট, কাঁধে বইয়ের ব্যাগ, হাতে লাট্টুর লেত্তি। লাট্টুর মালিক লাট্টু কুড়িয়ে নিয়ে সসম্ভ্রমে ডাক্তার পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করল,- 'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

ডাক্তার পাণ্ডে সোমনাথকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে বললেন.—'লোকনাথ সিংহ কি এই বাড়িতে থাকেন?'

সোমনাথ বলল,- 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বাবার শরীর তো ভাল নেই।'

ডাক্তার দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তুমি লোকনাথের ছেলে! দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না।'

তিনি সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক এই সময় কুসুম দরজা খুলে দেখল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সোমনাথকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলেছেন। সোমনাথ কোন মতে মুখ বার করে বলল,– 'মা, ইনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

সোমনাথকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার কুসুমের দিকে ফিরলেন। কুসুম তাঁকে এক নজরে দেখে চোখ নীচু করল, মৃদু স্বরে বলল.-'তাঁর শরীর খুব খারাপ, বাইরে আসতে পারবেন না।'

ডাক্তার বললেন,—'শরীর খুব খারাপ! আচ্ছা তাকে বলো ডাক্তার পাণ্ডে দেখা করতে চান। পনেরো বছর আগে সে আমাকে চাচাজি বলে ডাকত।'

ঘরের ভেতর লোকনাথের কানে সব কথাই আসছিল, সে সানন্দে চিৎকার করে বলল,—'চাচাজি! আপনি এসেছেন! কুসুম, ওঁকে ঘরে নিয়ে এস।'

কুসুম দোরের পাশে সরে দাঁড়াল, ডাক্তার পাণ্ডে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পেছনে সোমনাথ।

ঘরে প্রবেশ করে লোকনাথকে দেখেই ডাক্তার পাণ্ডে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রবীণ ডাক্তার এক লহমায় বুঝতে পারলেন লোকনাথের কাছে মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

বিছানার কিনারায় বসে ডাক্তার বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন,—'বাবা লোকনাথ, এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার! মুখ দেখে চেনা যায় না। কি—কী রোগ?'

লোকনাথ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—'চাচাজি, আপনি ডাক্তার, নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন, আমার আর কত দিন।'

ডাক্তারের চোখ জলে ভরে উঠল,—'এ কি—রাজভোগ?'

লোকনাথ বলল,—'ঠিক ধরেছেন। একেবারে শেষ অবস্থা।' দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হেসে বলল,—'এবারে কালো ঘুঁটির চাল। তিন চালে কিস্তিমাৎ।'

কুসুম ছেলের পানে তাকাল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল,—'আয় তোকে খেতে দিই।'

ওরা ঘর থেকে চলে গেলে ডাক্তার পাণ্ডে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন,—'গত পনেরো বছর ধরে কত জায়গায় না তোমাকে খুঁজেছি। কোথাও তোমার পাত্তা পেলাম না। হতাশ হয়ে খোঁজা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম, হঠাৎ সেদিন একজনের মুখে শুনলাম, বম্বে শহরের এই গলিতে তোমার নামে একজন থাকে। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু তোমার যে এই দশা দেখব তা কি ভেবেছিলাম।'

লোকনাথ বলল,—'চাচাজি দুঃখ করবেন না, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে।' একটু থেমে বলল,—'বাবা কেমন আছেন?'

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বললেন,—'তাঁর কথা আর কি বলব। তুমি চলে আসার পর মানুষটা একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছে। মেজাজ সব সময় সপ্তমে চড়ে আছে। শরীরও আর আগের মতন

নেই, বাতের যন্ত্রণায় অধিকাংশ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। এই পনেরো বছরের মধ্যে তিনি পনেরো দিন নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছেন কিনা সন্দেহ। এখন আমি বলি কি, তুমি বাবা বাড়ি ফিরে চল।'

একটু চুপ করে থেকে লোকনাথ বলল,--'বাবার কি তাই ইচ্ছে?'

ডাক্তার পাণ্ডে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন,—'না, মুখ ফুটে কিছু বলেননি, তবে তাঁর মনের কথা তো জানি, তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। মনে মনে ছটফট করছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। জানো তো ওঁর স্বভাব, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না-'

মলিন মুখে লোকনাথ খানিক চুপ করে রইল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল,—'চাচাজি, আমার রক্তেও তো ওই একই অহংকার রয়েছে। অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে আমি ফিরে যাব না। আমি যা করেছি তার জন্যে আমার তিলমাত্র লজ্জা নেই। আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন, আমার ছেলে সোমনাথকেও দেখলেন। ওদের জন্যে আমি লজ্জা পাব ভেবেছেন! কখনো না।'

পাশের ঘরে সোমনাথ মেঝেয় পিঁড়িতে বসে এক মনে জলখাবার খাচ্ছে; কুসুম তার পাশে বসে আছে, কিন্তু তার কান পড়ে আছে ও-ঘরের দিকে। লোকনাথের গলা শোনা যাচ্ছে—'আপনি ঠাট্টা করে আমাদের বংশের দুটি দোষের কথা বলতেন। (দাবার ছকের দিকে আঙুল দেখিয়ে) একটি তো এই। নিজেই বুঝতে পারি, না মরা পর্যন্ত আমার এ নেশা ঘুচবে না।—সোমনাথ!'

পাশের ঘর থেকে সোমনাথ উত্তর দিল—'যাই বাবা।' মুখ মুছতে মুছতে সে কাছে এসে দাঁড়াল। লোকনাথ হাসিমুখে বলল, 'খেলার জন্যে তৈরি?'

সোমনাথ সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

'দেখা যাক কে হারে কে জেতে। হারলে আমার দুঃখ নেই, ছেলেরা চিরদিনই বুড়োদের হারিয়ে দেয়। চাচাজি, সংসারের এই নিয়ম, না? আপনাকে কিন্তু আম্‌পায়ার হতে হবে।'

পাণ্ডে বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়লেন। খেলা শুরু হল। একাগ্র চোখে ছকের পানে তাকিয়ে দুজনে ঘুঁটি চালছে, পাণ্ডেও মন দিয়ে খেলা দেখছেন। পাশের ঘরে কুসুম মাঝে মাঝে দোরের কাছে এসে ওদের দেখছে, আবার সরে যাচ্ছে—

রাস্তা থেকে বৈরাগীর সুর শোনা গেল—

কাকো বন্দো কাকো নিন্দো
দোনো পাল্লা ভারী।

* * * *

পুরন্দরপুরের অর্ধ-নাগরিক পরিবেশের মধ্যে একনাথ সিংহের বাড়িটা যেন জরাহীন অমরত্বের জয়টীকা পরে দাঁড়িয়ে আছে। পনেরো বছরে তার তিলমাত্র ক্ষয়-ব্যয় হয়নি।

সদর বারান্দার মাঝখান থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠেছে; দুপাশে কাঠের রেলিং দেওয়া সেকেলে ধরনের সিঁড়ি। দোতলায় সিঁড়ির মুখ থেকে লম্বা বারান্দা, তার একপাশে সারি-সারি দরজা, অন্য পাশে খোলা আকাশ। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি বড় টেবিলের ওপর নানা রকমের ফল সাজানো রয়েছে, টেবিলের পিছনে একটি সেলফের ওপর কাঁচের বাটি গেলাস রাখা আছে। টেবিলের সামনের দিকে রুপোর প্লেটের ওপর এক গেলাস শরবৎ ঢাকা রয়েছে।

একনাথের খাস চাকর গোবর্ধন টেবিলের কাছে উবু হয়ে বসে আছে এবং সতর্ক ভাবে একটা দরজার পানে তাকিয়ে আছে। সকালবেলা একনাথের শয্যাত্যাগের সময় হয়েছে।

খাবারঘরের দরজা ঠেলে অল্পবয়সী একটি ঝি বারান্দায় বেরিয়ে এল, এক হাতে বালতি-ভর্তি এঁটো গেলাস-বাটি, অন্য হাতে এঁটো থালা। গত রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন সে মাজতে নিয়ে যাচ্ছে। বালতির মধ্যে বাসনগুলো দাসীর পা ফেলার তালে তালে ঝন্ ঝন্ শব্দ করছে।

গোবর্ধন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আঙুল তুলে চাপা তর্জনের সুরে বলল,—'স্‌স্‌। তোর কি হাঁটার কোন ছিরিছাঁদ নেই! পা ফেলছে দেখ না, যেন রাজসভায় নাচতে চলেছে! (একনাথের

ভেজানো দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) কর্তার কানে যদি যায়, তোর মুণ্ডু কেটে গেণ্ডুয়া খেলবেন।'

ঝিয়ের নাম তারা, সে পা টিপে টিপে গোবর্ধনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল,—'কর্তাবাবুর মেজাজ আজ কেমন ?'

গোবর্ধন বলল,—'গোল করিস না। মেজাজ খুব খারাপ, সকাল থেকে ক্ষেপে আছেন। যে সামনে পড়বে তার আর রক্ষে নেই।—যা, নিঃসাড়ে সরে পড়।'

'যাচ্ছি দাদা। আজ যে কপালে কি আছে ঠাকুর জানেন!' তারা-ঝি বালতি এবং থালা সামলাতে সামলাতে সিঁড়ির পাশে চলল। যেতে যেতে পিছন ফিরে চাইতে লাগল। সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল, বাসনগুলো বিপুল ঝনৎকার তুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়াতে আরম্ভ করল। ভয় পেয়ে তারা-ঝি কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। গোবর্ধন শিউরে উঠে দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরল।

একনাথ সিংহের শয়নঘরটি লম্বায়-চওড়ায় বেশ প্রশস্ত। পুরনো ফ্যাশনের ভারী ভারী আসবাব, ঘরের মাঝখানে চাঁদোয়া দেওয়া প্রকাণ্ড খাট-পালঙ্ক। একনাথ খাটের ওপর কোল পেতে বসে আছেন; তাঁর কোলে ' রামচরিত মানস'। তিনি মাঝে মাঝে দু-একটি দোঁহা গুণ গুণ শব্দে উচ্চারণ করছেন। পনেরো বছরে তাঁর চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, কেবল ঝাঁকড়া ভুরুতে পাক ধরেছে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল, তিনি ব্যঙ্গ-স্বরে বলে উঠলেন,—'পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে রাম বনে গিয়েছিলেন! মিথ্যে কথা—বাজে কথা! রাম বনে গিয়েছিলেন দশরথকে জব্দ করবার জন্যে।'

কোল থেকে 'রামচরিত মানস' তুলে তাচ্ছিল্যভরে তিনি পাশে ফেললেন, ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বার করে দেখেই উগ্রস্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন —'গোবরা!'

রুপোর থালার ওপর শরবতের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢুকল,—'এই যে শরবৎ।'

একনাথ কটমট করে তার পানে তাকালেন,—'শরবৎ আনা হয়েছে? ক'টা বেজেছে তার হিসেব আছে?'

'আজ্ঞে সাতটা।'

'তাহলে আফিম কখন দেওয়া হবে? তোমাকে রোজ মনে করিয়ে দেবার জন্যে কি আর একটা চাকর রাখতে হবে?'

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর শরবৎ রেখে গোবর্ধন ছুটে গেল ঘরের কোণে একটি মেজের দিকে। দেরাজ খুলে একটি চাঁদির আফিমের কৌটো নিয়ে ছুটে এসে একনাথের সামনে দাঁড়াল। কৌটো খুলে একনাথ আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যবাণ ছুটল। গোবর্ধন আবার শরবৎ হাতে নিয়ে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

একনাথ আফিমের গুলি মুখে ফেললেন, শরবতের সাহায্যে সেটি গলাধঃকরণ করলেন, তারপর গেলাস ফেরত দিয়ে বললেন,—'ডাক্তার হতভাগা গেল কোথায়? কেউ তার খবর জানে?'

গোবর্ধন আফিমের কৌটো যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল,—'আজ্ঞে তিনি তো পনের দিনের ছুটি নিয়ে বাইরে গেছেন, আজ ফেরবার কথা।'

একনাথ বললেন,—'আজ যদি না ফেরে ডাক্তারকে জবাব দেব। আমি বাতের যন্ত্রণায় মরছি, আর তিনি গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন। অমন ডাক্তারে আমার দরকার নেই।'

'আজ্ঞে কর্তা।'

'যাও, তুমি বেরোও এখন।'

গোবর্ধন ঝটিতে শরবতের গেলাস নিয়ে প্রস্থান করল।

বারান্দায় একজন চাকর ঝাঁট দিচ্ছিল, গোবর্ধন চোখ পাকিয়ে তাকে শাসন করল,—'কর্তাবাবু বাতের যন্ত্রণায় মরছেন, আর তুই ঝাঁট দিচ্ছিস? এত বড় আস্পর্ধা! যা তোকে জবাব দিলাম—' সে প্রভুত্ব-

পূর্ণ ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাল। ঝাড়ুদার ভৃত্যটিও রসিক ব্যক্তি, সে কপট বিনয়ের ভঙ্গিতে সেলাম করে ঝাড়ু বগলে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

গোবর্ধন তখন নিরিবিলি আর এক গেলাস শরবৎ তৈরি করে আত্মারামকে নিবেদন করবার উপক্রম করছে, নীচের দিকে নজর পড়ল, চারজন বেহারা একটি পাল্কী কাঁধে ফটক থেকে বাড়ির দিকে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে সেই দিকে চেয়ে রইল। তার মনে প্রশ্ন জাগল—পাল্কী করে কে আসে? এ বাড়িতে পাল্কীর পাট তো অনেক দিন উঠে গেছে।

বারান্দার সামনে বেহারারা পাল্কী নামাল। পাল্কীর দরজা খুলে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে লাফিয়ে বাইরে এল। তারপর আস্তে আস্তে পা বের করে বেরিয়ে এল একটি রোগা শুকনো চেহারার লোক; বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, শরীরের কাঠামো দেখে মনে হয় এক-কালে ভারি জোয়ান ছিল, কিন্তু এখন তার বুকে ও বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চোখ কোটরগত, গাল শুকিয়ে গেছে। লোকটি জমিদারবাবুর সর্দার লাঠিয়াল বসন্ত সিং, মেয়েটি তার কন্যা ললিতা।

বসন্ত সিংয়ের অবসন্ন শরীর নুয়ে পড়েছে, কোনমতে মেয়ের হাত ধরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির মাথায় গোবর্ধন দাঁড়িয়ে ছিল, সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল,—'সর্দারজি, এই রোগা শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন? আপনার জখমের ঘা তো এখনো সারে নি।'

বসন্ত সিং গম্ভীর মুখে বলল,—'মরার আগে এ ঘা আর সারবে না। মালিককে এত্তেলা দাও, তাঁর কাছে আর্জি আছে।'

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,—'কিন্তু সর্দার, মালিকের মেজাজ আজ খুবই খারাপ, সকালবেলা উঠেই আমার মাথাটি চিবিয়েছেন। আপনি এসময় তাঁর কাছে গেলে···বরং আজ বিকেলবেলা—'

অধীর স্বরে সর্দার বলল,—'আমার দেরি করার সময় নেই। তুমি যদি এত্তেলা না দাও, আমি বিনা হুকুমে মালিকের কাছে যাব।'

সর্দার একনাথের খাস কামরার পানে পা বাড়াল।

গোবর্ধন ভয় পেয়ে বলল,—'না না, আমি খবর দিচ্ছি। এত্তেলা না দিয়ে গেলে কর্তা আমাকে খুন করবেন।' সে আগে আগে চলল, মেয়ের হাত ধরে সর্দার তার পিছনে রইল।

একনাথ আগের মতই বিছানায় বসে আছেন, কিন্তু তাঁর বসার ভঙ্গিটা আরো উগ্র, যেন তাঁর মনের কটাহে চিন্তাগুলো টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। গোবর্ধনকে দেখে তিনি জ্বলে উঠলেন,—'আবার কী! কে তোকে ডেকেছে?'

গোবর্ধন হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল,—'আজ্ঞে সর্দার বসন্ত সিং—'

একনাথ বললেন,—'তার আবার কি হল? মরে গেছে নাকি?'

দোরের কাছ থেকে বসন্ত সিং বলল,—'আজ্ঞে না, মরিনি এখনো, তবে বেশি দেরি নেই মালিক।' সে সামনে এসে জোড়হাতে মাথা নোয়াল, তারপর হাঁটু মুড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। একনাথ কঠিন দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'তুই আবার কি মনে করে এসেছিস? ভাল লোককে সর্দার লেঠেলের পদ দিয়েছিলাম। কোথায় শত্তুরের হাড় গুঁড়ো করবে, তা নয়, নিজেই মার খেয়ে ফিরে এসেছে। অপদার্থ কোথাকার! যা, তোকে বরখাস্ত করলাম, তোর মতন লেঠেল আমার দরকার নেই।'

একনাথের রূঢ়বাক্যে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে বসন্ত সিং মেয়েকে কাছে টেনে নিল, বলল,—'মালিক, বিশ বছর আপনার গোলামী করছি, কাজে কখনো ফাঁকি দিই নি। খুন জখম যখন যা হুকুম করেছেন হুকুম তামিল করেছি, কখনো পিছপাও হই নি, বুকের রক্ত দিয়ে কাজ হাসিল করেছি। কিন্তু এবারের চোটটা আমায় শেষ করে দিয়েছে। আপনাকে আর বরখাস্ত করতে হবে না, স্বয়ং যমরাজ নোটিশ দিয়েছেন। আমি শেষ পর্যন্ত মালিকের সেবা করতে পেরেছি, আমার কোন দুঃখ নেই—'

'তবে হুট্ করে আমার ঘরে ঢুকলি কেন? কি চাস তুই?'

'মালিক, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই মেয়েটা ছাড়া (ললিতা

চোখ তুলে নিরীহভাবে বাপের পানে চাইল) আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, আজ থেকে আপনি ওকে পালন করবেন।'

একনাথ আকাশ থেকে পড়লেন, 'অ্যাঁ, আমি তোর মেয়েকে মানুষ করব ?' তিনি আবার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,—'চালাকি পেয়েছিস ! তোকে কুকুরে কামড়েছে রে হতভাগা। যা—এই দণ্ডে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।'

বসন্ত সিং উঠে দোরের দিকে চলল,—'তাই যাচ্ছি মালিক, কিন্তু মেয়ে রইল। ওকে আপনার বাঁদী করে রাখবেন।'

একনাথ চিৎকার করে উঠলেন,—'ওরে হতচ্ছাড়া, যাচ্ছিস কোথায় ? মেয়েটাকে নিয়ে যা, ওকে আমি পুষতে পারব না। বাড়িতে একটা মেয়েছেলে নেই, কে ওকে দেখবে ?'

দোর পর্যন্ত গিয়ে সর্দার আস্তে আস্তে ফিরল, তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরে মেঝেয় বসে পড়ল। তার চোখের জ্যোতি নিভে গেছে, সে অব্যক্ত কণ্ঠে বলল,—'গোবর্ধন ভাই, একটু জল—'

গোবর্ধন এতক্ষণ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। একনাথ গর্জন ছাড়লেন,—'ঘরের কোণে জলের কুঁজো দেখতে পাচ্ছিস না, হতভাগা উল্লুক—।'

গোবর্ধন ছুটে গিয়ে সরাই থেকে জল নিয়ে যখন সর্দারের কাছে এল, সর্দার ততক্ষণে এলিয়ে পড়েছে। গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গলা থেকে বেরিয়ে এল, —'সেলাম মালিক।'

গোবর্ধন তার মুখে জল ঢালবার চেষ্টা করল, কিন্তু জল মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। ললিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলে কেঁদে উঠল। ঠিক এইসময় ডাক্তার পাণ্ডে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ডাক্তার বসন্ত সিংকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, একনাথ বলে উঠলেন,—'দেখ তো ডাক্তার, মরে গেল নাকি !'

ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে বসন্ত সিংয়ের নাড়ী টিপলেন, বুকে হাত দিয়ে দেখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চাইলেন,—'হ্যাঁ,

বুকের স্পন্দন থেমে গেছে— 'ডাক্তারের মুখে তিক্ত কঠিনতা ফুটে উঠল, তিনি কেটে কেটে কথা বললেন,—'আর একটা দুঃসংবাদ আছে ঃ আপনার একমাত্র ছেলে লোকনাথও মারা গেছে।'

হঠাৎ ঘরের মধ্যে নিস্তরঙ্গ নীরবতা নেমে এল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। বসন্ত সিংয়ের শব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, গোবর্ধন ললিতার হাত ধরে নিয়ে গেছে। এই আধঘণ্টার মধ্যে একনাথ ও ডাক্তার পাণ্ডে একটি কথারও বিনিময় করেননি, একনাথ নিশ্চল হয়ে চেয়ারের দিকে চেয়ে আছেন, ডাক্তারের অভিযোগ ভরা দৃষ্টি একনাথের ওপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে একনাথ ডাক্তারের পানে আরক্ত চক্ষু তুললেন, বিকৃতস্বরে বললেন,—'লোকনাথ যদি মরে গিয়ে থাকে তাতে আমার কি! আমার কিছুই আসে যায় না।'

ডাক্তার নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন,—'দারুণ অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সে মারা গেছে।'

একনাথ ফেটে পড়বার উপক্রম করলেন,—'এসব কথা তুমি আমাকে কেন শোনাচ্ছ? বলেছি তো লোকনাথ সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র আগ্রহ নেই।'

ডাক্তারের গলা আরো ভারী হয়ে এল,—'জানি। সে যে আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলল, একথা আমি ভুলতে পারছি না। তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলে—'

একনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না, খাট থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে চিৎকার করে উঠলেন,—'শুনতে চাই না—ওরা আমার কেউ নয়—' হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার ফলে তাঁর পায়ে বাতের ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছিল, তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, ডাক্তার তাঁকে ধরে খাটের পাশে বসিয়ে দিলেন। একনাথ দাঁতে দাঁত চেপে ডাক্তারের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন,—'সবাই বজ্জাৎ, সবাই দাগাবাজ শয়তান। আমি চিনি না। তোমাদের সবাইকে চিনি। তোমার ফন্দি আমি বুঝেছি।

তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলেকে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও?'

ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লেন,—'আমার কোন রকম ফন্দি-ফিকির নেই, থাকলেও কোন কাজে লাগত না। একটা কথা আপনি বোঝবার চেষ্টা করুন, আপনার নাতি বা আপনার পুত্রবধূ আপনাকে ভালবাসে না, আপনি যদি তাদের এ বাড়িতে আনতে চান, মনে হয় না তারা আসতে রাজী হবে।'

ক্ষণকালের জন্য গুম হয়ে গিয়ে একনাথ প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের মত ফেটে পড়লেন—'কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাড়িতে আসতে রাজী হবে না! চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসব—' ডাক্তারের সংশয়পূর্ণ মাথানাড়া দেখে তিনি দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন—'আমার কথার ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কার! যাও তুমি, এখনি তাদের ধরে নিয়ে এস।'

ডাক্তার দেখলেন ওষুধ ধরেছে, তিনি আরো দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,—'বাবুজি, বম্বে শহরটা ঠিক পুরন্দরপুর নয়। সেখানে পুলিস আছে, আইন-আদালত আছে। তাছাড়া আপনার নাতি আঁর পুত্রবধূ তো মাটির পুতুল নয় যে তুলে নিয়ে আসব। তারা জলজ্যান্ত মানুষ, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে —'

'স্বাধীন ইচ্ছা!' আমার ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা, আমি এখন ওদের গার্জেন। যাও, এখনি আমার উকিলকে ডেকে আনো!'

'যে আজ্ঞে, যাচ্ছি—' মুখে উদ্বেগ ও মনে সন্তোষ নিয়ে ডাক্তার প্রস্থান করলেন। একনাথ আপন মনে গজরাতে লাগলেন—'আমার কথা অগ্রাহ্য করবে! দেখে নেব। এবার এমন শিক্ষা দেব যা জন্মে ভুলবে না।...'

কয়েকদিন পরে।

সদর বারান্দার নিম্নতম ধাপের এককোণে বসে ললিতা আপন মনে পুতুল নিয়ে খেলছে, একটি পুতুলকে ফ্রক পরিয়ে কোলে শুইয়ে সুর করে ঘুমপাড়ানি ছড়া বলছে—

সাতসমুদ্র পার থেকে

ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়ে

আসবে খুকুর বর--

ললিতা পুতুলকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন, তারপর সোমনাথ নামল, সব শেষে নামল কুসুম। তার বিধবার বেশ, মুখে ঘোমটা। ললিতা পুতুলখেলা থামিয়ে অবাক হয়ে তাদের পানে চেয়ে রইল।

পাণ্ডে আগে আগে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, সকলের পিছনে সোমনাথ। সে ললিতার পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে তার পুতুল খেলার আয়োজন দেখল, একটু নাক উঁচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ললিতা বিক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের বারান্দায় গোবর্ধন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে নীচু হয়ে কুসুমকে অভ্যর্থনা করল। তার মুখের ভাব গদগদ, সে ডাক্তারকে খাটো গলায় বলল,--'কর্তাবাবু ঘরেই আছেন, তাঁকে এত্তেলা দেব?'

ডাক্তার বললেন,—'দরকার নেই, উনি জানেন।'

গোবর্ধন কর্তার ঘরের পর্দা সরিয়ে একধারে দাঁড়াল, ডাক্তার কুসুমকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পুরনো ধরনের আরাম-কেদারায় একনাথ বসে আছেন, পরনে জমকালো পোশাক। ভুরু কুঁচকে তিনি গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন, ডাক্তারের গলা-খাঁকারি শুনে সেই দিকে তাকালেন। কুসুমের ওপর চোখ পড়তেই তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। পাণ্ডে কুসুমকে ইঙ্গিত করে এগিয়ে যেতে বললেন। কুসুম চোখ নীচু করে একনাথের পায়ের কাছে গেল, হাঁটু মুড়ে মাথা ঠেকিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করল। একনাথ একবার তার দিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কড়া সুরে বললেন,—'এই বাড়িতে তুমি থাকবে, আমার হুকুম। আমার সামনে কিন্তু কখনো আসবে না। যাও—অন্দরমহলে যাও!' তিনি রাজকীয় ভঙ্গিতে অন্তঃপুরের দরজার দিকে আঙুল দেখালেন।

কুসুম মাথা নীচু করে সেই পথে চলে গেল। একনাথ তখন পাণ্ডের দিকে ফিরে বললেন,—'ছেলেটা কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন,—'সোমনাথ? অ্যা--কোথায় গেল! দেখছি।' তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সোমনাথ নীচে ললিতার সঙ্গে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলছে, ললিতা সম্ভ্রমের সঙ্গে শুনছে। সোমনাথ লাট্টুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে বলল,—'পুতুলখেলা আবার খেলা! ও তো সবাই পারে। তুমি লাট্টু ঘোরাতে পার?'

ললিতা হতাশ স্বরে বলল,—'না তো। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

সোমনাথ বলল,—'এ তুমি শিখতে পারবে না। ভারি শক্ত খেলা।'

ললিতার মুখ দেখে মনে হল সে এখনি কেঁদে ফেলবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলল,—'আচ্ছা আচ্ছা, শেখাচ্ছি।--এই নাও, লেত্তি আঙুলে জড়িয়ে এই এমনি করে—ছুঁড়ে দাও।'

ললিতা লাট্টু ছুঁড়ল, লাট্টু সোমনাথের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চোখ পাকিয়ে বলল, 'আর একটু হলেই আমার মাথাটা ফুটো করে দিয়েছিলে।'

সে লাট্টু তুলে নিয়েছে এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে বললেন,—'তুমি এখানে কি করছ? চল চল, তোমার ডাক পড়েছে।' তিনি ফিরে চললেন, সোমনাথ লাট্টু পকেটে রাখতে রাখতে তাঁর অনুগামী হল। ললিতা জলভরা চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের ঘরে সোমনাথ বৃদ্ধের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ভাবভঙ্গী নির্ভীক কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ। একনাথ তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইলেন, কিন্তু তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হল। নিজের দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন,—'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম সোমনাথ, আমার বাবার নাম লোকনাথ সিংহ, আমার ঠাকুরদা পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।'

একনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আত্মসংবরণ করলেন, শেষে বললেন,— 'তুমি লেখাপড়া শিখেছ?'

সোমনাথ বলল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি।'

একনাথ হাত তুলে তাকে কাছে ডাকলেন, সোমনাথ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল! তিনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন,—'আমাকে চেন?'

'আজ্ঞে না।' সে ডাক্তার পাণ্ডের দিকে তাকাতে তিনি ধীরস্বরে বললেন,—'ইনিই তোমার পিতামহ পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।'

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, —'আপনি আমার দাদু? বাবার মুখে শুনেছি আপনি মস্ত বড়লোক, একজন রাজা। সত্যি আপনি রাজা?'

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি ডাক্তারকে বললেন,—'একে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও ডাক্তার।'

সোমনাথ চকিত হয়ে দু'জনের মুখের পানে চাইল। ডাক্তার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন,—'চল সোমনাথ, তোমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

অন্দর-মহলে পূজার ঘর। গৃহদেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিগ্রহটি আকারে ছোট হলে কি হয়, প্রত্যহ খুব ঘটা করে তাঁর পূজা হয়।

পুরোহিতমশাই দেবীর সামনে স্তোত্রপাঠ করছেন, কুসুম জোড়হাতে তদগত ভাবে দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে বসে আছে। দেবীর পদপ্রান্তে কয়েকটি পাত্রে রক্তজবা ফুল।

স্তোত্রপাঠ শেষ হলে বৃদ্ধ পুরোহিত ও কুসুম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর পুরোহিত কুসুমের দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন,—'মা, তুমি নিজের বাড়িতে এসে সংসারের ভার বুঝে নিয়েছ এ বড় আনন্দের কথা। গিন্নীমা-র মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, বাড়িতে এমন একজন মেয়ে নেই যে পূজার যোগাড়-যন্ত্র করে। এতদিন পরে তুমি এসে সব ব্যবস্থা করেছ, দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এরপর দেখো, সব বিপদ-আপদ কেটে যাবে।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে কুসুম বলল,—'ঠাকুরের দয়া।'

সোমনাথের পড়ার ঘরে ফরাস-ঢাকা তক্তপোষের মাঝখানে বসে সে খাতার ওপর ঝুঁকে হাতের লেখা মক্স করছে। তক্তপোষের এক কোণে ললিতা বসে পুতুল খেলছে, কিন্তু পুতুলের চেয়ে সোমনাথের দিকেই তার মন পড়ে আছে বেশি। সে মাঝে মাঝে সোমনাথের পানে ঘাড় উঁচু করে চাইছে। একসময় সে বলল,—'কি লিখছ?'

সোমনাথ মুখ না তুলে বলল,—'হাতের লেখা রপ্ত করছি।'

'ও।—নিজের নাম লিখতে পার?'

সোমনাথ এবার মুখ তুলল,—'এত বোকার মতন কথা বলতে পারে এই মেয়েটা—'

ললিতা তাড়াতাড়ি বলল,—'আচ্ছা, আচ্ছা, লিখতে পার! কিন্তু আমার নাম লিখতে পার কি?'

খানিকক্ষণ চোখ পাকিয়ে থেকে সোমনাথ বলল,—'এদিকে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি লিখতে পারি কি না।'

ললিতা এসে হুমড়ি খেয়ে বসল, সোমনাথ খাতায় লিখতে লিখতে বলল,—'ল-লি-তা। কেমন, লিখতে পারি?'

ললিতা সন্দিগ্ধ ভাবে বলল,—'ঠিক লিখেছ তো?'

'ঠিক লিখেছি মানে?' সোমনাথ হঠাৎ চোখ বড় করে বলল,—'অ্যাঁ, তুই কি পড়তে জানিস না?'

ললিতা বলল,—'না। কেউ তো আমায় শেখায়নি।'

'তাই নাকি! আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই শেখাব। আজ আমি তোর গুরু। বুঝলি?' সোমনাথ ললিতার মাথায় হাল্কা একটা চাঁটি মারল।

এই সময় পাণ্ডে এলেন, সোমনাথকে প্রশ্ন করলেন, 'কী, কেমন আছ?'

সোমনাথ বলল,—'আজ্ঞে ভাল আছি। কিন্তু এই মেয়েটাকে কেউ লেখাপড়া শেখায় না কেন?'

পাণ্ডে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—'কি জানো, তোমার দাদু মেয়েদের লেখাপড়া শেখা পছন্দ করেন না—'

'কিন্তু বোম্বাইয়ের সব মেয়েই তো স্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। আমি দাদুকে বলব।'

'না না, তার দরকার নেই। তুমি যদি ললিতাকে লেখাপড়া শেখাতে চাও শেখাতে পার।' ডাক্তার চলে গেলেন।

সোমনাথ তখন ললিতার দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল,—'মন দিয়ে শোন্। আগে তোকে বর্ণপরিচয় শেখাব। এদিকে আয়।'

ললিতা অনুগত ছাত্রীর মত তার সামনে এসে বসল—'বলুন গুরুজি।'

সোমনাথ খাতায় বড় বড় করে অ লিখল, আঙুল দেখিয়ে বলল, —'এই হল—অ।'

সামনে ঝুঁকে ললিতা অ দেখল, তারপর মুখ তুলে বলল,—'অ। —একে অ বলে কেন?'

সোমনাথ বলল,—'কেন বলে সে খবরে তোমার দরকার নেই। বল—অ।'

'আচ্ছা—অ। এবার চল ঘোড়া ঘোড়া খেলি।'

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল,—'তোর মাথায় কি খেলা ছাড়া কিছুই ঢোকে না? চুপ করে বোস। বল্—আ।'

বড় করে আ লিখে আঙুল দিয়ে দেখাল। ললিতা বলল,—'আ। তুমি লাট্টু ঘোরাবে না?'

গর্জন করে সোমনাথ বলল,—'না। বল—আ।'

নির্লিপ্তভাবে ললিতা বলল,—'আ। একে আ বলে কেন?'

গুরুজির পক্ষে আর ধৈর্যরক্ষা করা সম্ভব হল না, তিনি ছাত্রীর গালে একটি চড় মারলেন। ছাত্রী ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

অন্তঃপুরের একটি ঘরে কুসুম মেঝেয় বসে প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে। তার সামনে অনেকগুলি রুপোর রেকাবি ও খাবারের ঝুড়ি। গোবর্ধন

গেলাসে জল ভরছে। সে এখন বেশ আনন্দে আছে।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন কথা বলে চলেছে,—'বৌদিদি, কর্তা-বাবুর এত অল্প রাগ অনেকদিন দেখিনি। সকাল থেকে আজ এখনো আমাকে একটি বার গালাগালি দেননি। গড়গড়ার নল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা শুধু বললেন,—নল বদলে দে। অবাক কাণ্ড।'

মুখে একটু হাসি নিয়ে কুসুম গোবর্ধনের গল্প শুনছিল, এখন একটি রেকাবি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'এই নাও বাবার জলখাবার। সময়ের দিকে নজর রেখো। ঠিক সময়ে ঘরে নিয়ে যেও, এক মিনিট আগে নয় পরেও নয়। তুমি বরং খাবার নিয়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেই ঘড়িতে ন'টা বাজবে, অমনি ঘরে ঢুকবে। তাহলে তিনি রাগ করবেন না।'

গোবর্ধন বলল,—'যা বলেছ বৌদিদি। তুমি যদি গোড়া থেকে এসে আমাকে সব কাজ শিখিয়ে দিতে, তাহলে কর্তাবাবু কোনদিনই আমার ওপর রাগ করতেন না।'

এক হাতে জলখাবারের রেকাবি অন্য হাতে জলের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন চলে গেল। কুসুম সেই দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।'

ওদিকে একনাথ নিজের বিছানায় অর্ধশয়ান হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাতের ব্যথায় হাঁটু ফুলেছে, হাঁটুতে ফ্লানেলের পটি জড়ানো, হাঁটুর নীচে তাকিয়া।

কাগজ ফেলে দিয়ে তিনি ডাকলেন,—'গোবর্ধন!' গলার স্বর তেমন রুক্ষ নয়।

কিন্তু গোবর্ধনের সাড়া নেই। ভুরু কুঁচকে তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। মেজাজ চড়তে শুরু করল। গাড়োলটা গেল কোথায়। তিনি আবার কড়া সুরে ডাকলেন,—'গোবর্ধন!'

এবারও গোবর্ধনের দেখা নেই। রাগে ফুলতে ফুলতে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনরকমে গিয়ে আরাম-কেদারায় বসে পড়লেন,—'হতভাগা গাড়োলটাকে আজ দূর করে দেব।'

এই সময় ঠং ঠং করে ন'টা বাজাল। গোবর্ধন রেকাবি ও গেলাস হাতে প্রবেশ করল।

একনাথ বাঘের মত চোখ পাকিয়ে চাইলেন, তারপর গোবর্ধনের হাত থেকে গেলাস আর রেকাবি ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেয় আছাড় মারলেন, বললেন,—'এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি রে হারামজাদা উল্লুক?'

গোবর্ধন বলল,—'আজ্ঞে আমি তো দোরের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

একনাথ এবার অবাক হলেন, তারপর খিঁচিয়ে উঠলেন,—'দাঁড়িয়ে ছিলি তো সাড়া দিচ্ছিলি না কেন?'

গোবর্ধন বলল,—'আজ্ঞে বৌদিদি বললেন যে ঠিক ন'টা বাজলে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে।'

রাগে দিশাহারা হয়ে একনাথ গর্জন ছাড়লেন,—'বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেকুব কোথাকার!—যাচ্ছিস?'

গোবর্ধন আর দাঁড়াল না, একদৌড়ে কুসুমের কাছে উপস্থিত হল। কুসুমের খাবার সাজানো তখনো শেষ হয়নি, সে মুখ তুলল। গোবর্ধন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—'সর্বনাশ হয়েছে বৌদিদি, কর্তাবাবু খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে যা-নয়-তাই বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন?'

'সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আমি খাবার নিয়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, যেই ঠং ঠং করে ন'টা বাজল অমনি ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু কর্তা তখন চটে লাল—'

কুসুম বলল,—'বুঝেছি। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি বরং সোমনাথ আর ললিতাকে ডেকে আন। বাবার খাবার নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

গেলাস ও প্লেট তুলে নিয়ে কুসুম দৃঢ়পদে শ্বশুরের ঘরের দিকে চলল। গোবর্ধন শঙ্কিত মুখে চোখ গোল করে চেয়ে রইল। একনাথ কুসুমকে তাঁর সামনে যেতে বারণ করে দিয়েছেন, তবু সে যাচ্ছে। এইবার বুঝি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধল।

চেয়ারে বসে একনাথ আপন মনে তর্জন-গর্জন করছিলেন, কুসুম পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। সেই দিকে তাকিয়ে একনাথের বাচনিক বাহ্বাস্ফোট বন্ধ হয়ে গেল, তিনি স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে প্যাঁচার মত বসে রইলেন।

কুসুম তাঁর বাঁ-পাশে এসে চুপ করে দাঁড়াল। একনাথ প্রথমে তার দিকে তাকালেন না। তারপর আড়চোখে একবার খাবারের দিকে তাকালেন। কুসুম নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ একনাথ তিরিক্ষ সুরে বললেন,—'কি চাও?'

কুসুম মৃদুকণ্ঠে বলল,—'খাবার এনেছি।'

'দরকার নেই।'

কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ কিছুক্ষণ পরে আড়চোখে দেখলেন কুসুম যায়নি, বললেন,—'কথা কানে যায়নি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

কুসুম নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। একনাথের মুখে আষাঢ়ে মেঘের অন্ধকার, চোয়াল বজ্রের মত কঠিন; এ অবস্থায় তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তিনি কুসুমের হাত থেকে প্লেট কেড়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। মুখ কিন্তু বজ্রগম্ভীর হয়ে রইল।

খাওয়া শেষ হলে কুসুম প্লেট নিয়ে গেলাস এগিয়ে ধরল। একনাথ গেলাসে চুমুক দিয়েছেন এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দৃশ্যটি দেখে ডাক্তারের মুখ ক্ষণেকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়েই আবার শান্ত নির্লিপ্ত ভাব ধারণ করল। তিনি এগিয়ে এলেন। একনাথ জলের গেলাস কুসুমকে ফেরত দিয়ে ডাক্তারের প্রতি ভীষণ ভ্রূকুটি করে বললেন,—'তোমার আবার কি দরকার?'

কুসুম গেলাস ও রেকাবি নিয়ে চলে গেল, দোরের কাছ থেকে একবার ফিরে তাকাল। ডাক্তার হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন,—'কিছু না বাবুসাহেব, রোজের হাজিরা দিতে এসেছি। পায়ের ব্যথাটা কেমন?'

একনাথ বললেন,—'সে-কথা বলে লাভ কি ? রোগই যখন সারাতে পার না তখন রোজ এসে জেরা করার কি দরকার ?'

ডাক্তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন,—'চেয়ারে বসলে দেখছি আপনার যন্ত্রণাটা কম থাকে। ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছেন তো ?'

একনাথ বললেন,—'তোমার ওষুধ খেলে ছাই হয়। ও ওষুধ আমি গোবর্ধনকে খাওয়াচ্ছি, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি যদি একটু খোলে।'

পাণ্ডে সজোরে হেসে উঠলেন। একনাথের ভ্রূকুটি আবার গভীর হল,—'এতে হাসির কী আছে ? তোমার ওই রদ্দি ওষুধ আমার দরকার নেই, তোমার রোজ রোজ এসে খোঁজ-খবর নেবারও দরকার নেই। তোমার ডাক্তারি বাদ দিয়েও আমি ভাল থাকতে পারি।'

'সে তো খুবই ভাল কথা, আমিও তাই চাই। এখানে আসতে না হলে অন্য রোগীগুলোর দিকে নজর দিতে পারি।—প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় ডাক্তার, বাবুসাহেব। আচ্ছা চলি।' ডাক্তার পিছু ফিরলেন।

একনাথের গলা থেকে শব্দ বার হল,—'হুম্।'

বাগানে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে, পনেরো বছর পরে ফোয়ারা থেকে আবার জল উৎসারিত হচ্ছে। সকালবেলা বাগানের এক পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ললিতা কোঁচড়ে একরাশ ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে মালাটি প্রায় দুই হাত লম্বা হয়েছে।

পিছন দিক থেকে সোমনাথ হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে আসছে। ললিতার পাশে এসে সে ঘোড়ার মত চিঁহি চিঁহি শব্দ করে বলল,—'ঘোড়া হাজির।'

ললিতা আহ্লাদে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, কোঁচড়ের ফুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ললিতা সোমনাথের পিঠে চড়ে বসল, ফুলের মালা লাগামের মত তার মুখে পরিয়ে দিয়ে মুখে টক্ টক্ শব্দ করে বলল,—'আগে বঢ়ো—আগে বঢ়ো—'

হামা দিতে দিতে সোমনাথ বলল,—'সওয়ারী যাবে কোন দিকে ?'

ললিতা বলল,—'সওয়ারী যাবে ফোয়ারার দিকে। তার তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবে। টক্ টক্।'

ঘোড়ার মতন অঙ্গভঙ্গী করে চিঁহিঁ চিঁহি শব্দ করতে করতে সোমনাথ ফোয়ারার দিকে চলল।

ফোয়ারার চারদিক গোল করে সিমেন্ট বাঁধানো, চৌবাচ্চায় লাল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘোড়া ও আরোহিণী পাশাপাশি হাঁটু মুড়ে বসে আঁজলা ভরে জল তুলে মুখে দিল, তারপর সিমেন্টের ওপর বসে গল্প করল। সোমনাথ বলল,—'আমার পকেটে একটা জিনিস আছে।'

ললিতা সাগ্রহে প্রশ্ন করল,—'কি জিনিস ভাই?'

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল, 'আবার! গুরুজি বলতে পার না!'

ললিতা শুধরে নিয়ে বলল,—'কি জিনিস গুরুজি?'

ভারিক্কি চালে সোমনাথ পকেট থেকে একটি দেশলাইয়ের বাক্স বার করল,—'এতে কী আছে জান?'

'কি আছে, দেশলাইয়ের কাঠি?'

'না—আরশোলা।'

ললিতা অমনি কুঁকড়ে গেল। সোমনাথ বলল,—'এটাকে পুষব ভাবছি।'

ললিতা বলল,—'আরশোলা কেউ পোষে নাকি!'

'পুষলেই হল। লোকে কুকুর পোষে, পাখি পোষে, আরশোলা পুষলে দোষ কি?'

'আরশোলা ঘেউঘেউ করে ডাকবে? বুলবুলের মতন গান গাইবে?'

'বলতে পারি না, হয়তো শেখালে শিখবে।' বাক্সটি সন্তর্পণে একটু খুলে সোমনাথ ভেতরে উঁকি মারল,—'ত্যাখো কেমন গোঁফ নাড়ছে।'

দু'জনে মাথা ঠেকাঠেকি করে দেখতে লাগল। ললিতা বলল,—'মনে হচ্ছে ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দিলে হয়।'

সোমনাথ বলল,—'দূর বোকা! আরশোলা কি জল খায়! ওরা তেল খায়।'

দূর থেকে গোবর্ধনের গলা শোনা গেল,—'এখানে তোমাদের কী

হচ্ছে ?'

সে কাছে এসে দাঁড়াতেই সোমনাথ বলল,—'গোবর-দা, কী সুন্দর একটা আরশোলা !'

গোবর্ধন অমনি পশ্চাৎপদ হল,—'অ্যাঁ—আরশোলা ! ফেলে দাও—ফেলে দাও। আরশোলা ভারি পাজি জন্তু—ওটাকে জলে ফেলে দাও—'

সোমনাথ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'তুমি বুঝি আরশোলাকে ভয় কর ?'

গোবর্ধন আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল,—'ভয় আমি কাউকে করি না—কিন্তু—' দেশলাইয়ের বাক্স হাতে সোমনাথ এগিয়ে আসছে দেখে সে আবার পিছু হটতে লাগল—'এ আবার কি···এরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না···আরশোলা ছ'চক্ষে দেখতে পারি না—দেখলেই গা সিরসির করে—ছোটবাবু, ভাল হবে না বলছি—।' চকিতে পিছন ফিরে গোবর্ধন দৌড় মারল। সোমনাথ ও ললিতা হাসতে হাসতে তার পিছনে ছুটল।

অন্তঃপুরের একটি ঘরে মেঝের ওপর একটি আসনে বসে ডাক্তার পাণ্ডে আহার করছেন, হাত-পাখা নিয়ে তাঁর সামনে বসে কুসুম খাওয়া তদারক করছে।

খেতে খেতে পাণ্ডে কথা বলছেন,—'এই ছ'মাসেই বাবুসাহেব অনেক বদলে গেছেন।'

কুসুম চোখ নীচু করে বলল,—'সে আপনি ভাল বলতে পারেন।'

পাণ্ডে বললেন,—'হ্যাঁ মা, বোঝা যায়। এখন ওঁকে দেখে বেশ প্রফুল্ল মনে হয়, শরীর অনেক ভাল হয়েছে। মা, ওষুধপত্র কিছু নয় ; আসল হল মন, মন-মেজাজ ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। গত পনেরো বছর বাবুসাহেবের মুখে হাসি দেখিনি ; আশা হচ্ছে শিগগিরই ওঁর হাসিমুখ দেখতে পাব।'

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কুসুম বলল,—'মা চণ্ডী তাই করুন।'

একনাথ নিজের ঘরে মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—'গোবর্ধন !'

গোবর্ধনের দেখা নেই। একনাথ কিছুক্ষণ দোরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মেঝেয় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কতকটা আত্মগত ভাবেই বললেন,—'কোথাও আড্ডায় বসেছে হতভাগা ! নাঃ, ওকে দিয়ে আর চলবে না।'

তাঁর আফিমের সময় হয়েছে। তিনি নিজেই গিয়ে দেরাজ খুলে আফিমের কৌটোটি তুলে নিলেন। দেরাজে আরো অনেক টুকিটাকি জিনিস রয়েছে, অনেকদিন তিনি নিজের হাতে দেরাজ খোলেন নি, আজ ওইগুলির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সবই ধুলোয় ঢাকা পুরনো জিনিস, তার মধ্যে দাবার ছক ও ঘুঁটির বাক্স রয়েছে। একটু দ্বিধা করে তিনি সে দু'টি বার করলেন, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে স্নেহের ভঙ্গিতে তাদের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। অজ্ঞাতসারে একটা চাপা নিশ্বাস পড়ল।

হঠাৎ বন্ধ জানলার খড়খড়ি দিয়ে নীচে থেকে একটা হল্লার আওয়াজ এল। একনাথ ভ্রূকুটি করলেন, দাবার ছক ও ঘুঁটি নামিয়ে রেখে জানলার কাছে গেলেন, জানলার পাল্লা খুলে নীচের দিকে তাকালেন।

জানলার ঠিক নীচে বাগানের এক কোণে সোমনাথ ও ললিতা গোবর্ধনের সঙ্গে কাণামাছি খেলছে। বাড়ির অন্য ঝি-চাকর—তাদের মধ্যে তারা-ঝিও আছে—পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। গোবর্ধনের চোখে ঝাড়ন বাঁধা, সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আর ললিতা ও সোমনাথ তার মাথায় চাঁটি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। গোবর্ধন তাদের ধরতে পারছে না। খেলা বেশ জমে উঠেছে। ঝি-চাকরেরা খেলা দেখতে দেখতে উঁচু গলায় হেসে উঠছে।

জানলা থেকে অলক্ষিতে একনাথ এই দৃশ্য দেখছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

এই সময় সোমনাথ পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটি নিয়ে পা

টিপে টিপে গোবর্ধনের পিছন দিকে গেল, আরশোলা বার করে তার ফতুয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল। গোবর্ধন চিড়িক মেরে উঠল —'ওরে বাবা, এটা কি রে! পিঠের ওপর সড় সড় করছে—'

সোমনাথ খিল খিল করে হেসে বলল,—'গোবর-দা, চিনতে পারলে না? আ-র শো-লা!'

নিমেষে চোখের বাঁধন খুলে ফেলে গোবর্ধন লাফালাফি আর চিৎকার করতে লাগল,—'ওরে বাবা রে, গেছি রে—এই যে কাঁধের ওপর—আরে, পেট খামচাচ্ছে –'

জানলায় দাঁড়িয়ে একনাথ মৃদু মৃদু হাসছেন। পনেরো বছর পরে প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

নীচে থেকেও যৌথ হাসির কলধ্বনি আসছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একনাথ হাঁক দিলেন, 'গোবর্ধন!'

সকলের চোখ একসঙ্গে জানলার পানে উঠল। তারপর চক্ষের পলকে দাস-দাসীরা অন্তর্হিত হল। ললিতা ও সোমনাথ জানলার দিকে চেয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। গোবর্ধন ভবিযুক্ত হয়ে বলল,

'আজ্ঞে যাই বাবু।'

জানলা থেকে সরে এসে একনাথ বিছানায় বসে আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন, তাঁর মুখে হাসি-হাসি ভাব লেগে রইল।

গোবর্ধন এসে মনিবের সামনে দাঁড়াল। তার গা-ভরা অস্বস্তি, মাঝে মাঝে গা-ঝাড়া দিচ্ছে; আরশোলাটা বোধহয় এখনো তার জামার মধ্যে আছে।

একনাথ কড়া চোখে তার পানে তাকিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে? অমন চিড়িক মারছিস কেন?'

গোবর্ধন বলল,—'আজ্ঞে না, ও কিছু নয়—।'

'কিছু নয় তো চুপ করে দাঁড়া।'

হঠাৎ গোবর্ধন পেটের জামা মুঠোতে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল,—'ধরেছি ব্যাটাকে—ধরেছি—!' বলেই কর্তার দিকে চেয়ে থেমে গেল।

কর্তা বললেন,—'কী ধরেছিস? তোর পেটে কী হয়েছে? পেট

কামড়াচ্ছে ?'

গোবর্ধন তখন কাতর স্বরে বলল,—'আজ্ঞে না বাবু, পেট কামড়াচ্ছে না—একটা আরশোলা—ছোটবাবু জামার মধ্যে আরশোলা ছেড়ে দিয়েছেন।'

হাসি চাপার চেষ্টায় একনাথের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তিনি বললেন,—'তুই নিজে একটা আরশোলা। জল দে, আফিম খাব।'

গোবর্ধন সোরাই থেকে জল ঢেলে আনল, একনাথ আফিমের গুলি মুখে দিয়ে জল খেলেন। গোবর্ধন সোরাইয়ের মুখে গেলাস চাপা দিয়েছে এমন সময় আবার আরশোলা তার বগলে সড় সড় করে উঠল। সে বগল চেপে ধরে একটা অর্ধোচ্চারিত চিক্কুর ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার একনাথের গলার মধ্যে হাসির মত একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল।

সোমনাথ ঘরে ঢুকল; একনাথ অমনি গম্ভীর হলেন। সোমনাথ বলল,—'দাদু, গোবর-দা'র নাচ দেখলেন?'

একনাথ গম্ভীর মুখে বললেন,—'ওর পেছনে লেগেছ কেন? আরশোলা নিয়ে এ কি খেলা! কোথায় পেলে আরশোলা?'

সোমনাথ উৎসাহ ভরে বলল,—'নীচে ভাঁড়ার ঘরে কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে অনেক আরশোলা আছে দাদু।' দেরাজের দিকে যেতে যেতে—'এটা অনেক পুরনো দেরাজ, এর মধ্যেও আরশোলা আছে।'

দেরাজের ওপর দাবার ছক ও ঘুঁটি দেখে সে অবাক দৃষ্টিতে একনাথের পানে চাইল, ঘুঁটির কৌটো হাতে নিয়ে বলল,—'দাদু, আপনি দাবা খেলতে জানেন?'

হাস্যকর প্রশ্ন। একনাথ বললেন,—'ফাজিল ছেলে! তুমি জান?'

সোমনাথ বলল,—'জানি। বাবা শিখিয়েছিলেন।'

একনাথের চোখের ওপর বাষ্পচ্ছায়া পড়ল, তিনি নিশ্বাস চেপে বললেন,—'তোমার বাবাকে আমি শিখিয়েছিলাম।'

সোমনাথ ছক আর ঘুঁটির কৌটো নিয়ে একনাথের পাশে এসে দাঁড়াল,—'আমার সঙ্গে এক দান খেলবেন দাদু?'

আয়ত চোখে চেয়ে থেকে একনাথ বললেন,—'তুমি খেলবে আমার সঙ্গে! তোমার সাহস তো কম নয়! আমি চোখ বুজে খেললেও তুমি হেরে যাবে।'

সোমনাথ উত্তেজিত হয়ে বলল,—'কখখনো না, আপনি আমাকে হারাতে পারবেন না। বাজি রাখুন, আমি যদি আপনাকে হারিয়ে দিই কী দেবেন বলুন?'

একনাথ ক্ষণেকের জন্যে চোখ বুজলেন, লোকনাথের সঙ্গে শেষ দাবা খেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি চোখ খুলে বললেন,—'কী নেবে তুমি?'

'একটা টাট্টু ঘোড়া।'

'বেশ, তাই হবে। আর তুমি যদি হেরে যাও আমাকে কী দেবে?'

সোমনাথ ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর পকেট থেকে লাট্টু বের করে বলল,—'এই লাট্টুটা আপনাকে দেব।'

সোমনাথের সীরিয়াস মুখের দিকে চেয়ে একনাথের ঠোঁটের কোণ নড়ে উঠল, তিনি বললেন, 'টাট্টুর বদলে লাট্টু! বেশ, বাজি রইল। —বোর্ড লাগাও।'

সোমনাথ মহানন্দে টেবিলের ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাতে লাগল। প্রশ্ন করল,—কোন ঘুটি আপনি নেবেন? সাদা না কালো?'

বিছানা থেকে নামতে নামতে একনাথ বললেন,—'কালো—আমি চিরদিন কালো ঘুটি নিয়ে খেলি।'

তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে টেবিলের সামনে বসলেন; ছকের ওপর ঘুটির অবস্থান পরিদর্শন করে বললেন,—'ঠিক আছে। তুমি আরম্ভ কর।'

সোমনাথ মন্ত্রীর ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিয়ে একনাথের মুখের পানে চাইল। একনাথ রাজার ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিলেন। সাদা কালো দুই বোড়ে মুখোমুখি বসল। খেলার লড়াই শুরু হয়ে গেল।

অন্তঃপুরের উঠোনে কুসুম পায়রাদের গম খাওয়াচ্ছে। কোঁচড়

থেকে গম নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিচ্ছে, একঝাঁক পায়রা গুঁতোগুঁতি করে তাই খাচ্ছে।

পুরোহিতমশাই পুজোর ঘরে স্তব পাঠ করছেন। গোবর্ধনের সংহত গলা শোনা গেল—'বৌদিদি—'

কুসুম ফিরে চাইল। গোবর্ধন চোখ বড় বড় করে কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ দেখে মনে হয় ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে। কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল,—'কী হয়েছে গোবর্ধন?'

মাথা নেড়ে গোবর্ধন বলল, 'তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না বৌদিদি, আমি নিজের চোখে দেখেছি তা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না—'

কুসুমের আতঙ্ক বাড়ছে—'সোমনাথ কোথায়?'

'আহা সেই কথাই তো বলছি বৌদিদি—'

ব্যাকুল স্বরে কুসুম বলল, —'শিগগির বল—সোমনাথ কোথায়?'

'কর্তাবাবুর সঙ্গে দাবা খেলছে। ভগবানের কী লীলা! স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি দাদা আর নাতি মুখোমুখি বসে দাবা খেলছেন। এ বাড়িতে আগে যেমন হত ঠিক তেমনি। পুরনো আমল কি আবার ফিরে এল বৌদিদি?'

কুসুমের চোখে জল এসে পড়ল, সে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

ওদিকে দাদা-নাতি দাবা খেলায় মগ্ন। সোমনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে আছে, চোখে একাগ্র তন্ময়তা। একনাথ মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছেন; তাঁর মনে বিভ্রম জাগছে এ কি সোমনাথ, না লোকনাথ?

লোকনাথই চাল দিচ্ছে, তারপর সোমনাথের গলার আওয়াজ আসছে,—'দাদু, এবার আপনার চাল।'

আচ্ছন্নের মতন একনাথ চাল দিচ্ছেন। মাথার মধ্যে ঘুরছে—লোকনাথ—সোমনাথ—আমার ছেলে—আমার নাতি—লোকনাথ যেন ছেলেকে আমার কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে; নিজে এল না, বড় অভিমানী ছিল—

জলখাবারের দুটি রেকাবি হাতে নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল। পিছনে গোবর্ধন। সে কুসুমের দিকে চোখ বেঁকিয়ে চাইল; যেন বলল,—'দেখলে? কী বলেছিলাম!'

কুসুন ইশারা করল, গোবর্ধন একটি ছোট টিপাই এনে খেলার টেবিলের পাশে রাখল। কুসুম রেকাবি দুটি টিপাইয়ের ওপর রেখে খেলোয়াড়দের দিকে চাইল, কিন্তু খেলোয়াড়দের কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। কুসুমের মুখ শান্ত, সে অনুচ্চ স্বরে বলল,—'বাবা, আপনার জলখাবার।'

একনাথ মুখ না তুলেই বললেন,—'বাইরে অপেক্ষা করতে বল, এখন আমি ব্যস্ত আছি।'

কুসুম ও গোবর্ধন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর কুসুম একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আপনার খাবার এনেছি বাবা।'

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন,—'তাকে কাল আসতে বল, আজ আমার সময় নেই।' এক ঘর গজ এগিয়ে দিয়ে বিজয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, -'কিস্তি।'

সোমনাথ একটু বিপদে পড়েছে; চারিদিকে শত্রু। কিন্তু পরিত্রাণের রাস্তা এখনো খোলা আছে। সে গজের মুখ থেকে রাজাকে সরিয়ে নিয়ে একনাথের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসল- অর্থাৎ কী এমন কিস্তি দিয়েছ!

এই সময় ডাক্তার পাণ্ডে বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। দাদা ও নাতি দাবা খেলায় মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কুসুমের পানে চেয়ে তাঁর মুখ হাসিতে ভরে উঠল, তিনি ভ্রূ তুলে নীরব প্রশ্ন করলেন—'কাণ্ডটা কী?'

কুসুম মৃদু হেসে খেলোয়াড়দের পানে চেয়ে রইল। ডাক্তার এসে একনাথের পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরে গেল। সোমনাথ নিজের মন্ত্রীকে কোণাকুণি দুঘর এগিয়ে দিয়ে বলল,- -'কিস্তি।'

একনাথ চমকিত হয়ে নিজের রাজা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন,

কিন্তু কোন ফল হল না; আরো দু' চাল পরে সোমনাথের মন্ত্রী একনাথের রাজার সামনে চেপে বসল, সোমনাথ বলল—'কিস্তি মাৎ।'

অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে একনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সত্যিই তিনি মাৎ হয়ে গেছেন, আর রাজা নিয়ে পালাবার রাস্তা নেই। ওদিকে সোমনাথ নাচতে শুরু করেছে, নাচছে আর বলছে,—'দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি, দাদু মাৎ হয়ে গেছেন -'

একনাথের মুখে কথা নেই, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে ছকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুসুম ঠোঁটের ওপর আঁচল চাপা দিয়েছে, গোবর্ধন দন্ত-বিকশিত করে মাথা চুলকোচ্ছে। ডাক্তার হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলেন।

সোমনাথ তখনো নাচছে -'দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি- মা তুমি সাক্ষী, ডাক্তারবাবু সাক্ষী- দাদু, আমাকে ঘোড়া দিন।' সে একনাথের সামনে হাত পাতল।

একনাথ মুখ তুলে বোকার মত বললেন, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ। বাজি রেখেছিলেন হেরে গেলে টাট্টু ঘোড়া দেবেন!' সে টপ করে খাবারের প্লেট তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।'

একনাথ লজ্জিত ভাবে ছক থেকে সোমনাথের পানে চাইলেন। বিড় বিড় করে বললেন,—'অনেকদিন খেলিনি···দুধের ছেলের কাছে হেরে গেলাম -'

সোমনাথ খেতে খেতে বলল,—'দাদু, আমার ঘোড়া?'

'দেব রে বাপু, দেব। কিন্তু কাল আবার খেলা বসবে, তোকে গজচক্র অশ্বচক্র করে ছেড়ে দেব- '

তিনি খাবারের প্লেট তুলে নিলেন। তাঁর মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলতে লাগল, মৃদু হাসি ক্রমে বাড়তে লাগল, শেষে একেবারে হো হো করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। যেন বহুকালের রুদ্ধ উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গিয়ে জলের উচ্ছ্বাস চারিদিকে উৎসারিত হল।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে কুসুম তাঁর পানে চেয়ে রইল। ডাক্তারের চোখও আর্দ্র হল, তিনি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সোমনাথের ঘোড়া কেনা হয়েছে, দুধের মত সাদা টাট্টু ঘোড়া। সহিসের ব্যবস্থাও হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে মুখের লাগাম ধরে সহিস দাঁড়িয়ে আছে, আর যোধপুরী ব্রিচেস পরে চাবুক হাতে নিয়ে সোমনাথ ঘোড়ায় চড়বার চেষ্টা করছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়া কিন্তু সহজ কাজ নয়, তা হোক না সে টাট্টু ঘোড়া।

যতবারই সোমনাথ ঘোড়ার পাশে গিয়ে লাফ মেরে পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে, ততবারই সে সরে সরে যাচ্ছে। বাড়ির কয়েকজন গোমস্তা ও চাকর দাঁড়িয়ে ঘোড়ার চড়া দেখছে ও নানা রকম মন্তব্য করছে।

গোবর্ধন বলল,—'ঘোড়াটা দেখছি ভারি দুষ্টু। ছোটবাবু, আমি বরং তোমাকে কোলে করে ওর পিঠে তুলে দিই।'

'না, আমি নিজেই চড়ব।' সোমনাথ আবার লাফ দিল, কিন্তু ঘোড়া আবার সরে গেল।

একজন গোমস্তা বুদ্ধি দিল,—'একটা টুল আনলে ভাল হয়, টুলে চড়ে সহজে ওঠা যাবে।'

দ্বিতীয় গোমস্তা বলল,—'ছোটবাবুর হাতের চাবুক দেখেই ঘোড়া ভয় পাচ্ছে। ওটা ফেলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

সোমনাথ রাগ করে বলল,—'তোমাদের আর বুদ্ধি দিতে হবে না, আমি যেমন করে পারি উঠব।'

গোবর্ধন বলল,—'আমি বলি কি, ঘোড়ার পা-গুলো চেপে ধরলে হয় না?'

গোমস্তা বলল,—'ঘোড়ার পায়ে ধরতে চাও তুমিই ধর না বাপু।'

সকলে হেসে উঠল।

দোতলায় নিজের জানলা থেকে একনাথ সব দেখছেন আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। যত সব অপদার্থ! একটা ছেলেকে ঘোড়ায় চড়াতে পারে না।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন,—'দাঁড়া সোমনাথ, আমি আসছি—'

তিনি বকতে বকতে দোরের দিকে চললেন।

নীচের বারান্দায় ললিতা একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে দোল খাচ্ছিল. একনাথ সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন ; পা ঠিক পড়ছে না। একটু খোঁড়াচ্ছেন। বারান্দা পার হয়ে তিনি বাগানের দিকে চলে গেলেন। ললিতা হাঁ করে চেয়ে রইল। সে আগে কখনো একনাথকে নীচের তলায় নামতে দেখেনি।

ওদিকে কুসুম ঠাকুরঘর থেকে পুজোর ফুল সাজিতে নিয়ে একনাথের ঘরে গেল। বিছানার পাশে সাজি রেখে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ঘরে একনাথ নেই। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবল— বাবা আবার কোথায় গেলেন ! ঘর ছেড়ে কোথাও তো যান না ! জানলা খোলা দেখে সে গিয়ে নীচে উঁকি মারল।

একনাথ বাগানে পৌঁছে গেছেন, সোমনাথকে লক্ষ্য করে তিনি বলছেন,—'দাঁড়া, ওরকম করে ঘোড়ায় চড়ে না—এই ভ্যাখ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

কুসুম গালে হাত দিয়ে জানলা থেকে সরে এল—'ওমা কি হবে, বাবা একেবারে নীচে নেমে গেছেন ! মা চণ্ডী, রক্ষে করো।'

কুসুম ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাগানে চাকর-গোমস্তারা একনাথকে আসতে দেখে যে-যার সরে পড়ল। একনাথের কোনদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি গিয়ে সহিসের হাত থেকে লাগাম নিয়ে সোমনাথকে বললেন,—'অমন করে ঘোড়ায় চড়ে না। এদিকে আয়, আমার কাঁধে ভর দে—হ্যাঁ—এবার ডান হাতে জিনের মুঠ ধরে লাফিয়ে ওঠ—এই তো ঠিক হয়েছে—'

ঘোড়া মানুষ চেনে, সে এবার সরে গেল না। সোমনাথ রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। একনাথ তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন,—'লাগামে বেশি ঢিল দিস না। হ্যাঁ, এবার বাগানের মধ্যে চক্কর দে ; প্রথমেই ছুট দিস না—ধীর কদম—'

সন্তুষ্ট বিচারকের দৃষ্টিতে অশ্বারূঢ় নাতিকে পরিদর্শন করে একনাথ বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

বারান্দার সিঁড়ির মুখে ডাক্তার পাণ্ডের সঙ্গে দেখা। পাণ্ডে বাইরে

ফটকের দিক থেকে আসছিলেন, একনাথকে নীচের তলায় দেখে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন;—'আরে এ কি কাণ্ড! আপনি একেবারে নীচে নেমে এসেছেন!'

'কেন আমি কি নীচে নামতে পারি না!' তাঁর মনে যতই তেজ থাক শরীরের শক্তি কমে গিয়েছিল, তিনি ক্লান্ত ভাবে সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে মুখে বিক্রম দেখিয়ে বললেন,—'তুমি ভেবেছ কী? আমি অক্ষম অকর্মণ্য?'

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন,—'না না, বাবুসাহেব, কিন্তু আপনার পায়ের ব্যথাটা—'

'কে বলে আমার পায়ে ব্যথা!' তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এক ধাপ উঠেই তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল, মুখ বিকৃত করে পায়ের যন্ত্রণা দমন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামা যত সহজ, ওঠা তত সহজ নয়।

ঠিক এই সময় কুসুম দ্রুতপদে নেমে এল। সে কোন কথা না বলে একনাথের একটা বাহু তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রাখল, বলল,—'এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন—আস্তে আস্তে উঠুন—'

একনাথ গলার মধ্যে একটা 'হুম্‌' শব্দ করলেন, কোন আপত্তি করলেন না। ডাক্তার পিছন থেকে বললেন,—'আমিও আসব নাকি? দু'দিক থেকে দু'জনে ধরলে আরো সহজে উঠতে পারবেন।'

একনাথ কড়া সুরে বললেন,—'না না, তোমাকে দরকার নেই।'

সিঁড়ির মাথায় উঠে একনাথ দাঁড়ালেন, কুসুম তাঁকে ছেড়ে দিল। ডাক্তারও পিছন পিছন উঠছিলেন, একনাথ তাঁর পানে বিজয়গর্বিত চোখে চেয়ে বললেন,—'দেখলে তো, পাখির মত উড়ে চলে এলাম।'

ডাক্তার মিটি মিটি হেসে বললেন,—'হ্যাঁ বাবুজি, একেবারে বাজপাখির মত। এবার চলুন, বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন।'

'আমার পা কিন্তু ঠিক আছে।'

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললেন,—'তাতে কোন সন্দেহ নেই। চলুন—চলুন—'

নিজের ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুলেন, ডাক্তার ও কুসুম খাটের দুপাশে। একনাথের মেজাজ আবার চড়ে গেল, তিনি ডাক্তার পাণ্ডের পানে কটমট চক্ষে চেয়ে বললেন,—'তোমার অত্যাচার আর আমি সহ্য করব না। রাতদিন একটা ঘরের মধ্যে আমাকে আটক করে রেখেছ। আমি কি জেলখানার কয়েদী? তুমি যাও, নিজের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব—ফের যদি তুমি এসে আমার পিছনে লাগো, হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে—'

পাণ্ডে প্রসন্ন স্বরে বললেন,—'না না বাবুজি, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি আপনি ডেকে না পাঠালে আর আমি আসব না। কেমন, তাহলে হবে তো? আচ্ছা আজ চলি।' কুসুমের দিকে চেয়ে একটু হেসে তিনি বিদায় নিলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর একনাথ একটা হাঁটু তুলে সন্তর্পণে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, মনে হল বাতে আক্রান্ত হাঁটুটা ফুলেছে। তিনি হাঁক ছাড়লেন,—'গোবর্ধন!'

কুসুম খাটের আরো কাছে এসে বলল,—'বাবা, গোবর্ধনকে ডেকে দেব? কি দরকার আমাকে বলুন না।'

মুখ গোঁজ করে একনাথ বললেন,—'হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। ডাক্তারের ওই দুর্গন্ধ ওষুধ আর লাগাব না। গোবর্ধনকে বল একবাটি তেল গরম করে এনে হাঁটুতে মালিশ করে দিক।'

কুসুম বলল,—'আমি এক্ষুনি গরম তেল এনে মালিশ করে দিচ্ছি, আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।'

একনাথ উঠে বসার উপক্রম করে বললেন,—'কিন্তু—'

কুসুম তাঁকে আবার শুইয়ে দিয়ে বলল,—'আপনি শুয়ে থাকুন, আমাকে আপনার পদসেবা করতে দিন।' সে দ্রুতপদে চলে গেল।

একনাথ বাষ্পাকুল চোখে ঊর্ধ্বে চেয়ে রইলেন।

*   *   *   *

বাগানে একটা গাছের ছায়ায় ঘোড়ার পিঠে বসে সোমনাথ বিশ্রাম করছে, সহিস পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে

দৌড়েছিল।

সহিস কপালের ঘাম মুছে বলল,—'এইবার নামুন ছোটসাহেব। আবার বিকেলে চড়বেন'।

সোমনাথ বলল,—'আর এক চক্কর দেব। তোমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি এখানেই থাকো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'

লাগাম নেড়ে সে ঘোড়াকে চালু করল।

একনাথ পূর্ববৎ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একটি বাটিতে সর্ষের তেল এবং লম্বা এক টুকরো ফ্লানেল কাপড় নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আংটা নিয়ে গোবর্ধন। কুসুম ইশারা করল, গোবর্ধন একটি টিপাইয়ের ওপর আংটা রেখে টিপাই খাটের পাশে এনে রাখল। কুসুম আঁচের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে একটি ছোট প্যাকেট খুলে অল্প কর্পূর তেলের মধ্যে ফেলে দিল, গোবর্ধনকে বলল, -'গোবর্ধন, বাবুসাহেবের হাঁটুর নীচে বালিশ দাও।'

একনাথ এতক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন, বিরক্ত মুখে বললেন, —'এসব কি হচ্ছে?'

কুসুম বলল, 'গরম তেল কর্পূর দিয়ে হাঁটুতে মালিশ করব।'

'কী হবে মালিশ করে?'

'ব্যথা সেরে যাবে।' খাটের কিনারায় বসে কুসুম গরম তেলে আঙুল ডুবিয়ে মালিশ করতে শুরু করল, অনুযোগের সুরে বলল,— 'এই শরীরে কি বাড়াবাড়ি সহ্য হয়! আমি জানতে পারলে হর্গিস্ নীচে নামতে দিতুম না।—গোবর্ধন, বাবুসাহেবের কপালে ঘাম হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস কর।'

একনাথ বকুনি খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। গোবর্ধন তাঁর মাথায় বাতাস করতে লাগল।

কুসুম তেল মালিশ করছে আর আংটায় ফ্লানেল তাতিয়ে সেঁক দিচ্ছে। সে কতকটা যেন নিজ মনেই বলতে লাগল,—'বাতের ব্যথা

কি সহজ ব্যথা, অনেক যত্ন নিলে তবে সারে। তারপর সেরে গেলে যা ইচ্ছে করা যায়।—ব্যথা কি একটু কম মনে হচ্ছে?'

একনাথ হাঁটু একটু নাড়াচাড়া করে বললেন,—'হুম, আর তেমন চিড়িক মারছে না। তুমি যাও, আর সেঁকের দরকার নেই।'

কুসুম বলল,—'সে কি বাবা, আরো আধ ঘণ্টা সেঁক দিতে হবে। আজ সারা দিন বিছানা থেকে উঠতে পাবেন না। গোবর্ধন, যাও, আরো কাঠকয়লা নিয়ে এস।'

গোবর্ধন চলে গেল। একনাথ মুখ গোমড়া করে বললেন,—'বেশ, লাগাও মালিশ, তোমারই কষ্ট, আমার কি! আমি দশদিন বিছানা থেকে উঠব না।'

এই সময় গোবর্ধন ছুটতে ছুটতে এসে বলল,—'সর্বনাশ হয়েছে, ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন!'

একনাথ খাড়া উঠে বসলেন,—'কি বললি, সোমনাথ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে! কি করে পড়ল? কোথায় পড়ল?'

গোবর্ধন বলল,—'তা তো জানি না হুজুর, সহিস ছুটে এসে বলল, —ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।'

একনাথ বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন,—'যত সব অপদার্থের দল—'

কুসুম বাধা দিয়ে বলল,—'বাবা, আপনি খাট থেকে নামবেন না। আপনার পা—'

'চুলোয় যাক পা! ছেলেটা বাঁচল কি মরল কেউ দেখছে না, কেবল চেঁচাচ্ছে—' একনাথ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

কুসুম ছুটে এসে বাধা দিল,—'বাবা, আপনি ঘরে থাকুন, আমি নীচে গিয়ে দেখছি কী হয়েছে। দেখেই আপনাকে খবর দেব। ছেলেরা কত পড়ে যায়, কত হাত-পা ভাঙে, তার জন্য এত ভাবনার কী আছে!'

কোন কথায় কান না দিয়ে একনাথ বললেন,—'গোবর্ধন, লাঠিটা দে।—কোন কথা শুনতে চাই না—আমি নীচে যাচ্ছি। ছেলেটার যদি কিছু হয়ে থাকে কাউকে আস্ত রাখব না—' লাঠি ধরে একনাথ

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে বেরুলেন।

কুসুম তেলের বাটি ইত্যাদি তুলে নিতে নিতে বলল,—'গোবর্ধন, তুমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাও, নইলে হয়তো পড়ে যাবেন। আমি আসছি।'

গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল।

একনাথ তখন সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামছেন। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাঁর অনুগামী হল।

সিঁড়ির নীচে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ললিতা দোল খাচ্ছিল, একনাথ সেখানে নেমে এক গর্জন ছাড়লেন,—'শম্ভু! গজাধর! রঘুয়া! কোথায় গেল হতভাগারা! দৌড়ে যা, ছাখ সোমনাথ কোথায়—।'

গর্জনের প্রথম ধাক্কাতেই ললিতা ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে গেল। একনাথের সেদিকে লক্ষ্য নেই, তিনি পা টেনে টেনে বাগানের দিকে চললেন। তিনচার জন চাকর তাঁর দিকে ছুটে আসছে দেখে তিনি আবার চিকুর ছাড়লেন,—'এদিকে আসছিস কেন রে অলপ্পেয়ের দল, সোমনাথ কোথায় আগে ছাখ—'

চাকরেরা পাকসাট খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে কুসুম তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখল ললিতা কাঠের ঘোড়া উল্টে সিঁড়ির নীচে চুপটি করে পড়ে আছে, সে তাকে হাত ধরে তুলে একনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একনাথ হতাশ স্বরে বললেন,—'ভগবান জানেন কোথায় পড়ে আছে ছেলেটা! সহিসটাই বা কেমন!—'

এই সময় ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ্ আওয়াজ শোনা গেল। একনাথ কথা থামিয়ে সেইদিকে তাকালেন। কদম-চালে ঘোড়া চালিয়ে সোমনাথ আসছে। একনাথ মহা উল্লাসে দু হাত তুলে বললেন,—'আরে এই তো সোমনাথ! তবে যে হতভাগারা বলল ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে!'

সোমনাথ এসে একনাথের সামনে ঘোড়া থামাল, একমুখ হাসি নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, বলল,—'হ্যাঁ দাদু, ঘোড়াটা আমায় ফেলে দিয়েছিল। এই ছাখো গায়ে ধুলো লেগেছে। কিন্তু আমি তখনি আবার উঠে এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসলাম। কি করে ঘোড়ার পিঠে

চড়তে হয় এখন আমি শিখে নিয়েছি, আর আমাকে ফেলতে পারবে না।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে একনাথ সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন,—'শাবাশ! এই তো পুরন্দরপুরের সিংহ বংশের ছেলে! বৌমা, দেখেছ, ছেলে কাকে বলে!'

কুসুম দেখবে কী, তার দুই চোখে তখন কান্নার বান ডেকেছে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ডাক্তার পাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন,—'এ কি, আবার আপনি নেমে এসেছেন! পায়ের ব্যথাটা কি সারতে দিতে চান না?'

'যাও যাও ডাক্তার, তোমার ডাক্তারি আর আমার দরকার নেই। তোমার চেয়ে ঢের ভাল ডাক্তার আমি পেয়েছি।' একনাথ সগর্বে কুসুমের পানে চাইলেন— 'হাঁটুতে আয়সা গরম তেল মালিশ করেছে যে ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

একনাথ নাতির কাঁধে হাত রেখে প্রায় স্বাভাবিক চালে সিড়ির দিকে চললেন, কুসুম তাঁদের পিছন পিছন গেল। ডাক্তার কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখ পরম তৃপ্তির হাসিতে ভরে উঠল।

* * * *

মানুষের জীবনে দশটা বছর অল্প কাল কী দীর্ঘ কাল তা নির্ণয় করা কঠিন। সুখী দম্পতির জীবনে দশটা বছর চক্ষের পলকে কেটে যায়, আবার কয়েদীর জীবনে দশ বছর কেটেও কাটতে চায় না। সবই আপেক্ষিক।

পুরন্দরপুরের জমিদার-বাড়িতে সকলের বয়স দশ বছর বেড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পুরোহিতমশাই গৃহদেবীর পূজা করেন, স্তোত্রপাঠ করেন। গোবর্ধনের কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে, তবু সে মাঝে মাঝে তারা-ঝি'র হাত ধরে হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করে, কর্তা অনেক দিন তাকে গালমন্দ করেননি।

কর্তা রোজ সকালবেলায় নীচের তলায় দপ্তরখানার চৌকিতে এসে বসেন। পিছনে ও দুপাশে মোটা তাকিয়া, হাতে গড়গড়ার নল। নায়েব

হিসেবের খাতা খুলে আয়-ব্যয়ের বয়ান শোনায়। একনাথের বয়স এখন সত্তর, কিন্তু তাঁর শরীরে বার্ধক্যের শিথিলতা আসেনি ; মুখের উগ্র গাম্ভীর্য যেন একটু নরম হয়েছে। দশটা বছর তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে অতি লঘুপদে চলে গেছে, কোথাও পদচিহ্ন রেখে যায়নি। ছেলেকে হারিয়ে তিনি যে মানসাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন, নাতিকে পেয়ে সে-দাহ শীতল হয়েছে।

বিকেলবেলা কুসুম ললিতার চুল বাঁধতে বসে। ললিতার বয়স এখন পনেরো-ষোল ; চেহারাটি ভারি স্নিগ্ধ। কৈশোরের উপকূলে দাঁড়িয়ে সে আসন্ন যৌবনের সোনার তরীর অপেক্ষা করছে।

চুল বাঁধার সময় ললিতা প্রশ্ন করে, 'বৌমা, বাবু কবে ফিরে আসবে ?'

কুসুম বলে,—'কলেজের ছুটি হলেই আসবে।'

'এবার তো একেবারে ছুটি, পড়া শেষ, আর কলেজে ফিরে যেতে হবে না ?'

'না, আর ফিরে যেতে হবে না।'

ললিতা কুসুমকে বৌমা বলে বাড়ির অন্য সকলের দেখাদেখি। সোমনাথকেও ছোটবাবু বলত, এখন শুধু বাবু বলে।

চার মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরে এল।

ডাক্তার পাণ্ডে তাকে তিন মাইল দূরের রেলস্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন। জমিদার বাড়িতে একজন স্থায়ী রুগীর অভাবে ডাক্তার পাণ্ডে এখন আর নিয়মিত আসেন না, তবে জরুরী ফাই-ফরমাস খাটার সময় তাঁর তলব পড়ে।

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সোমনাথ উপস্থিত হল। একনাথ সদর ফটকের সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে পরিজন বেষ্টিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সোমনাথ একলাফে গাড়ি থেকে নেমে একনাথকে প্রণাম করল, একনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

সোমনাথের দেহে স্বাস্থ্যভরা যৌবনের দীপ্তি, মুখে নির্ভীক আনন্দের হাসি। একনাথ তার মুখের পানে সগর্ব চোখে চেয়ে গলার মধ্যে

একটা শব্দ করলেন,—'হুঁঃ। পরীক্ষা কেমন হল ?'

সোমনাথ প্রফুল্ল স্বরে বলল,—'ভাল হয়নি দাদু। তবে পাস করে যাব বোধহয়।'

একনাথ আবার গলার মধ্যে শব্দ করলেন,—'খালি হকি আর ফুটবল খেলেছ। যাও, এখন মুখ-হাত ধুয়ে খাও গিয়ে, তোমার মা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

সোমনাথ একদৌড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। একনাথ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন,—'তুমিও এসো ডাক্তার। আজ এখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন করবে।'

কুসুম আর ললিতা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, সোমনাথ এসে মা'কে প্রণাম করল। তারপর ললিতার পানে চেয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। চার মাস আগে সে যে-ললিতাকে দেখে গিয়েছিল, এ যেন সে-ললিতা নয়। তার বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কিন্তু সে চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে কুসুমকে বলল,—'মা, এ মেয়েটা কে ? একে তো আগে কখনো দেখিনি !'

কুসুম একটু হেসে ঘরের দিকে পা বাড়াল, বলল,—'খাবার সাজিয়ে রেখেছি, খাবি আয়।'

ললিতাও সোমনাথকে দেখে হঠাৎ জড়সড় হয়ে পড়েছিল, তার মুখে একটু ভীরু হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সোমনাথের কথায় তার হাসিটুকুও শুকিয়ে গেল। সোমনাথ যে মনের উচ্ছ্বাস চাপা দেবার জন্যে ঠাট্টা-তামাশার আশ্রয় নিয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল সোমনাথ সত্যিই তাকে চিনতে পারেনি।

'বাবু ! তুমি আমায় চিনতে পারলে না।'

'না। তোমার নাম কি ?'

ললিতার চোখ জলে ভরে উঠল, সে চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'এই ললি—' ব্যগ্রভাবে সোমনাথ তার অনুসরণ করতে গেল, কিন্তু ঘর থেকে মায়ের ডাক এল,—'সোমনাথ!'

সোমনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থেমে গেল, মায়ের আহ্বানে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাগানে একটা গাছের তলায় পাথরের বেদী, ললিতা সেই বেদীর ওপর বসে উদাস চোখে অদূরে ফোয়ারার পানে চেয়ে আছে। অভিমানে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। বাবু তাকে চিনতে পারল না। চার মাসে ভুলে গেল।

পিছন থেকে সোমনাথ নিঃশব্দে এসে তার চোখ টিপে ধরল। ললিতা প্রথমে চমকে উঠল, তারপর চুপ করে বসে রইল। সাড়া-শব্দ নেই।

সোমনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল,—'আমি কে?'

ললিতা ভারী গলায় বলল,—'জানি না।'

চোখ ছেড়ে দিয়ে সোমনাথ ললিতার পাশে বসল, বলল,—'রাগ হয়েছে?'

ললিতা উত্তর দিল না, অন্যদিকে চেয়ে রইল। সোমনাথ তখন বলল,—'সত্যিই কি আমি তোমাকে চিনতে পারিনি! তুমি এই ক'মাসে এতবড় হয়ে গেছ যে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তবে কেন আমায় ভয় দেখালে?' জল-ভরা চোখ সোমনাথের পানে ফিরিয়ে ললিতা তার কাঁধে মাথা রাখল। সোমনাথ তার কাঁধ জড়িয়ে নিয়ে স্খলিত স্বরে বলল,—'আর ভয় দেখাব না।'

তাদের মন গঙ্গা-যমুনার মত সঙ্গমের পানে ছুটে চলেছে। ছেলেবেলার সহজ সাহচর্যের প্রীতি অন্যরূপ ধারণ করেছে। স্থির সমুদ্র সহসা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

দপ্তরখানার চৌকিতে বসে বিকেলবেলা একনাথ তাকিয়ায় ঠেস

দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। সামনে ডাক্তার পাণ্ডে। পাণ্ডের সামনে রুপোর রেকাবিতে পান, তিনি মাঝে মাঝে পান তুলে মুখে দিচ্ছেন। অলসভাবে গাল-গল্প হচ্ছে। জল-হাওয়া চাষবাসের অবস্থা এইসব নিয়ে আলোচনা।

গোবর্ধন আফিমের কৌটো আর জলের গেলাস নিয়ে এল। একনাথ আফিমের গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, একঢোঁক জল খেলেন, তারপর আবার গড়গড়ার নল তুলে নিলেন। গোবর্ধন কৌটো গেলাস নিয়ে চলে গেল।

তারপর এলেন দেওয়ান। তাঁর হাতে কয়েকটা চিঠি। একনাথ প্রশ্ন করলেন. 'জরুরী চিঠি কিছু আছে?'

দেওয়ান বললেন,—'আজ্ঞে দু'খানি চিঠি জরুরী বলা চলে। ছোটবাবুর জন্যে পাত্রীর খবর আছে।'

একনাথ বললেন,—'ও···কারা খবর দিয়েছে? কেমন লোক? ইদানীং যেসব সম্বন্ধ আসছে আমার তেমন পছন্দ নয়। বংশমর্যাদা না থাকলে তো মেয়ে আনা যায় না।— কারা চিঠি লিখেছে?'

দেওয়ান বললেন,—'আজ্ঞে পড়ে শোনাচ্ছি।—এটি লিখেছেন তেজপুরের নরোত্তম সিংহ, পাত্রী তাঁর তৃতীয়া কন্যা—'

একনাথ চিন্তা-মন্থর স্বরে বললেন,—'তেজপুরের নরোত্তম সিংহ ···তাদের বরাবরই জানি, আমাদের সমান ঘর বলা যায়। কিন্তু জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় প্রায় সবই গেছে। (দেওয়ানকে) যতদূর মনে পড়ে ওদের একটা সম্পত্তি আমাদের কাছে বন্ধক আছে, তাই না? (দেওয়ান ঘাড় নাড়লেন) বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু এমন ভাঙন-ধরা ঘর থেকে সোমনাথের বৌ আনতে পারি না।'

দেওয়ান চিঠিখানি সরিয়ে রেখে অন্য চিঠি নিলেন,—'এটি লিখেছেন রায় গোপীকিশোর, ও বি ই, কে সি আই ই।'

'ইনি কে? নাম তো কখনো শুনিনি।'

পাণ্ডে বললেন,—'খুব বিখ্যাত লোক, দিল্লীর একজন বড় ব্যাংকার। অনেকগুলো কাপড়ের কলের মালিক, প্রচুর টাকা করেছেন।'

একনাথ বললেন,—'তা না হয় হল। কিন্তু বংশ কেমন? বংশের কথা কিছু আছে?'

চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে দেওয়ান বললেন,—'বংশের কথা কিছু দেখছি না। কেবল লিখেছেন মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জামাইকে চারলক্ষ টাকা যৌতুক দেবেন। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, দরকার হলে ফটো পাঠাবেন।'

মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করে একনাথ বললেন,—'যতসব ভুঁইফোঁড় বড়লোক। টাকা দেখাচ্ছে। বংশগৌরব নেই, বড়ঘরে মেয়ে দিয়ে জাতে উঠতে চায়। উঁহু বাদ দাও।—পাণ্ডে, দেখছ সমাজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? বনেদী ঘরের লোক যারা তাদের হাতে পয়সা নেই, আর যাদের পয়সা আছে তাদের বংশগৌরব নেই। বিদেশী রাজা রোজ নতুন আইন তৈরি করছে, সাবেক যা কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এসব কি ভাল?'

পাণ্ডে বললেন,—'কিন্তু বাবুসাহেব, সময় বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে তো। পরিবর্তন না হলে চলবে কেন? ভেবে দেখুন, সেকালে মানুষ গরুর গাড়ি চড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে যেত, এখন রেলগাড়ি চড়ে যায়। এটা কি মন্দ?'

একনাথ বললেন,—'না না, এসব তোমার বাজে যুক্তি। রেলগাড়ি চড়ে চড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজের খুঁটি হল পরিবার—বংশ। সেই খুঁটিই যদি উপড়ে ফেলে দাও তাহলে কী থাকবে? সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বললেন,—'আমার ছেলে একটা মস্ত ভুল করেছিল, তার ফল সে পেয়েছে। আমি এখন সেই ভুল শোধরাতে চাই। কালির দাগ মুছে ফেলতে হবে।'

পাণ্ডে বললেন,—'কিন্তু শুধু বংশই নয়, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তাও তো আছে। স্বতন্ত্র সাধ আহ্লাদ, স্বাধীনতা—সবই কি বংশের জন্যে বিসর্জন দিতে হবে? সমাজ বলুন, বংশ বলুন, সবই তো মানুষের জন্যে—'

কড়া সুরে একনাথ বললেন,—'না, বংশই হল সমাজের মূল, বংশ নিয়েই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।'

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে পাণ্ডে বললেন,—'বাবুসাহেব, আপনার এ ধারণা বর্তমান যুগে একেবারে অচল। পৃথিবী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, এখন আর কেউ একা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। সব মানুষ মিলিয়ে সমাজ, আমরা সবাই যেন এক পরিবারের মানুষ। নিজের বংশমর্যাদার অহংকারে কেউ যদি আলাদা থাকতে চায়, ক্ষতি তারই—'

একনাথ বললেন,—'তোমার এসব যুক্তি আমি মানি না। সিংহ চিরদিন সিংহই থাকবে, কখনো শেয়ালের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবে না। এই হল আমার কথা। যতদিন বেঁচে থাকব, আমার বাড়িতে এই রেওয়াজ চলবে, অন্য কারুর কথা খাটবে না।'

পাণ্ডে বিষণ্ণ ভাবে মুখ নীচু করে বসে রইলেন। একজন টেলিগ্রাফ পিওন এসে সেলাম করে দাঁড়াল। দেওয়ান প্রশ্ন করলেন,—'তার আছে ?'

রসিদ সই করে দেওয়ান তার হাতে নিলেন, একনাথের পানে চাইলেন। একনাথ বললেন,—'খুলে দেখ, ভাল খবর কি মন্দ খবর।'

পিওন বলল,—'ভাল খবর হুজুর, বকশিস দিতে হবে।'

পাণ্ডে খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রাম পড়লেন,—'ভাল খবর। সোমনাথ এম-এ পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।'

একনাথের উৎকণ্ঠিত মুখ আনন্দে ভরে উঠল—'অ্যাঁ! পাস করেছে! আমি জানতাম পাস করবেই। দেওয়ান, যাও, পিওনকে পঁচিশ টাকা বকশিস দাও।'

পিওন বকশিসের বহর দেখে চোখ গোল করে দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ান পকেট থেকে পঁচিশ টাকার নোট নিয়ে পিওনকে দিলেন। পিওন আভূমি সেলাম করে চলে গেল।

একনাথ টেলিগ্রামের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—'দেখি, দাও।'

একনাথ ইংরেজি জানেন না, তবু পরম যত্নে টেলিগ্রামটি চোখের সামনে রেখে তার রসাস্বাদন করলেন। গদগদ স্বরে বললেন,—

'ছেলেটার বুদ্ধি আছে, কি বল ?'

পাণ্ডে বললেন,—'সে আর বলতে! কোন্ বংশের ছেলে! ওর বাপও তো এই বয়সে এম-এ পাস করেছিল।'

একনাথ একটু থমকে গিয়ে বললেন,—'হ্যাঁ, তা বটে।— সোমনাথ কোথায় ? যাই, আমি নিজে গিয়ে তাকে খবরটা শোনাই। তার সঙ্গে বাজি ছিল—' মুচকি হাসতে হাসতে একনাথ উঠে ঘরের বাইরে গেলেন।

পাণ্ডে একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর মুখে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। দেওয়ান তাঁর কাছে এসে বললেন,—'আকাশের পানে চেয়ে কী দেখছেন ?'

ডাক্তার বললেন,—'সিঁদুরে মেঘ।'

কুসুম নিজের ঘরের বিছানায় বসে কাপড়ের ওপর ফুল তুলছে, ললিতা তার পিছনে হাঁটু গেড়ে তার মাথা থেকে পাকা চুল তুলছে।

কুসুম বলল,—'হয়েছে, অনেক তুলেছিস।'

ললিতা চুল তুলতে তুলতে বলল,—'আর কয়েকটা হলেই শেষ, তোমার মাথা একেবারে কালো হয়ে যাবে।'

মুখ তুলে কুসুম হেসে বলল,—'কালো মাথা আমার দরকার নেই। ছেলে বড় হল, দুদিন পরেই নাতির মুখ দেখব।'

ললিতা একটু থতমত খেয়ে জড়িত স্বরে বলল,—'তার এখনো অনেক দেরি আছে।'

কুসুম বলল,—'সে যা হোক, আমার মাথা ছেড়ে তুই একবার বাইরে গিয়ে ছাখ্ সোমনাথ কোথায়, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

ললিতা একটু উসখুস করে বলল,—'ও এখন বাগানে পাখির ঘর তৈরী করছে। দিনরাত তাতেই লেগে আছে। পাখির ঘর ছাড়া অন্য ভাবনা নেই।'

কুসুম বলল,—'যা ডেকে নিয়ে আয়। তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

ললিতা উঠে দোরের দিকে যাচ্ছে, বাইরে থেকে একনাথের গলায় ডাক এল— 'বৌমা! বৌমা!'

ললিতা এখনো একনাথকে ভয় করে, সে তাড়াতাড়ি দোরের পাশে লুকিয়ে পড়ল। কুসুম মাথায় আঁচল টেনে উঠে দাঁড়াল—'বাবা।'

টেলিগ্রামখানা নাড়তে নাড়তে একনাথ ঘরে ঢুকলেন,—'খবর শুনেছ, ছোঁড়া পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস—এইমাত্র তার এল। আমি ওর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম ও পাস করতে পারবে না, যদিও মনে মনে জানতাম পাস করবেই। হ্যা! হ্যা!'

দোরের আড়াল থেকে খবর শুনে ললিতার মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে একনাথের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একনাথ বললেন,—'একটা কিছু করা দরকার—আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম। তুমি পুরুতঠাকুরকে এই হপ্তায় একটা ভাল দিন দেখতে বল, সেদিন বাড়িতে উৎসব হবে—বাঈনাচ, বাজি পোড়ানো, গাঁয়ের মাতব্বরেরা আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, বাড়ি জমজমাট হবে। কি বল?'

কুসুম ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে তাই হবে বাবা।'

একনাথ বললেন,—'বেশ। কিন্তু সোমনাথ গেল কোথায়? বাড়িতে কোথাও দেখছি না।'

কুসুম বলল,—'শুনলুম বাগানে কোথায় নাকি পাখির ঘর বানাচ্ছে।—ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'না না, আমি নিজেই যাচ্ছি। একেবারে চমকে দেব।—পাখির ঘর বানাচ্ছে! হুঁঃ হুঁঃ—নিজের ঘর বানাবার সময় হয়েছে কিনা—' গলার মধ্যে হাসি চেপে রেখে একনাথ চলে গেলেন।

বাগানের এককোণে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সোমনাথ বাঁশের খুঁটোর ওপর তক্তা দিয়ে পাখির বাসা তৈরি করছে। অনেকটা পায়রার খোপের মত। ছোট ছোট পাখিরা এসে তার মধ্যে বাসা বাঁধবে, ডিম পাড়বে,

বাচ্চা ফোটাবে, এই তার লক্ষ্য।

ললিতা ছুটতে ছুটতে সেই দিকে আসছিল, কাছাকাছি এসে সে পা টিপে টিপে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সোমনাথ তখন ঠকাঠক হাতুড়ি চালিয়ে পেরেক ঠুকছে, ললিতা পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরল।

'এই ললি, কী হচ্ছে!'

ললিতা তার কানে কানে বলল,—'একটা ভারি সুখবর এনেছি, কী খাওয়াবে বল?'

চোখ থেকে ললিতার হাত ছাড়িয়ে সোমনাথ ফিরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ ললিতার হাসিভরা মুখের পানে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে বলল, —'কী খাওয়াব? এমন খাবার খাওয়াব যা খেতে খুব মিষ্টি কিন্তু পেট ভরে না।'

ললিতা অবাক হয়ে এক পা কাছে সরে এল, বলল,—'সে আবার কী খাবার?'

'কী খাবার জান না?' সোমনাথ নিজের আঙুল ললিতার ঠোঁটে ঠেকিয়ে সেই আঙুল নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করল, বলল,—'এই খাবার।'

লজ্জায় লাল হয়ে ললিতা এক পা পিছিয়ে গেল। বলল,—'যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।'

সোমনাথ মুখ টিপে হাসল,—'কৈ, কি সুখবর বললে না?'

ললিতা আবার এগিয়ে এল,—'দাদুর কাছে তার এসেছে, তুমি পাস করেছ, ফার্স্ট ক্লাস।'

ওদিকে একনাথ টেলিগ্রামের হলদে রঙের কাগজখানা হাতে নিয়ে সোমনাথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, ঝোপের মধ্যে সোমনাথ ও ললিতাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওরা তাঁকে দেখতে পায়নি, সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে খাটো গলায় কথা বলছে, ললিতার চোখ দুটি সোমনাথের মুখের দিকে উঠতে উঠতে আবার নত হয়ে পড়ছে। দুজনের মুখেই ভঙ্গুর হাসি। তারপর সোমনাথ ললিতাকে আরো কাছে টেনে নিল, ললিতা তার বুকে মুখ লুকলো।

একনাথ দেখলেন, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। ক্রোধে তাঁর

মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি ধৈর্য হারিয়ে ওদের দিকে পা বাড়ালেন কিন্তু এক পা গিয়ে তিনি থমকে গেলেন, তারপর পিছু ফিরে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। টেলিগ্রামের কাগজটা অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতে ধরা রইল।

সোমনাথ তখন ললিতার দুই কাঁধে হাত রেখে মুখের কাছে মুখ এনে সুর করে বলছে—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হারা
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ন তারা।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে একনাথ বিক্ষিপ্ত চিত্তে পায়চারি করতে লাগলেন। পঁচিশ বছর আগে যা ঘটেছিল, আবার কি তার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হল! লাঠিয়ালের মেয়েকে সোমনাথ—! কি কুক্ষণে মেয়েটাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

হাতে টেলিগ্রামের কাগজটার ওপর নজর পড়ল। ইচ্ছে হল কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলেন। কিন্তু তা না করে পকেটে রাখলেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দুরবগাহ দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ডুবে গেল।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যের ছায়া নেমেছে এমন সময় গোবর্ধন এসে দোরের কাছে দাঁড়াল,—'বাবু, তামাক সেজে আনব? আপনার আফিম খাবার সময় হয়েছে।'

সুপ্ত বাঘের ঘাড়ে পা দিলে যেমন হয়, একনাথ গর্জে উঠলেন,—'হতভাগা উল্লুক! কে তোকে ডেকেছে?'

গোবর্ধন থতমত খেয়ে বলল,—'আজ্ঞে—!'

'বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা! একনাথ আরক্ত চোখে চেয়ার থেকে ওঠবার উপক্রম করলেন।

গোবর্ধন একনাথের এমন উগ্র মূর্তি অনেক দিন দেখেনি, সে

ভড়কানো ঘোড়ার মত ছুটে পালাল।

কুসুম ঠাকুরঘরের প্রদীপ জ্বেলে বাইরে এসে দেখল গোবর্ধন মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল,—'কি হয়েছে গোবর্ধন ?'

গোবর্ধন বলল,—'আর বৌদিদি, যা হবার তাই হয়েছে। এতদিন পরে কর্তাবাবু আবার রেগে গেছেন।'

কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল,—'কি বলবে খুলে বল।'

গোবর্ধন খুলে বলল। শুনে কুসুমের মন নানারকম সন্দেহে ভরে উঠল। সে প্রশ্ন করল,—'সোমনাথ কোথায় ?'

গোবর্ধন বলল,—'তা তো জানি না বৌদিদি। দেখব ?'

'না, থাক—বাবার ঘরে আলো দিয়েছ ?'

'না বৌদি। তাঁর এখন আফিমও খাওয়া হয়নি। বাঘের মতন চেহারা দেখেই পালিয়ে এসেছি।'

'তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি দেখছি।'

একনাথ অন্ধকার ঘরে বসেছিলেন, কুসুম কেরাসিনের টেবিলল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢুকল, টুলের ওপর ল্যাম্প রেখে বললেন,—'বাবা, আফিম দেব ?'

নিরাসক্ত স্বরে একনাথ বললেন,—'দাও।'

দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো এনে কুসুম একনাথের হাতে দিল, কুঁজো থেকে জলের গেলাস ভরে পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিতে দিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বলনেল,—'সব ভেঙে পড়ছে, আবার সব ভেঙে পড়ছে—'

কুসুম চেয়ারের পাশে নতজানু হয়ে ব্যগ্র স্বরে বলল,—'কিছু ভেঙে পড়বে না বাবা, সব ঠিক থাকবে। এ বাড়িতে কারুর সাহস নেই আপনার কথার ওপর কথা বলে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

একনাথ মনে একটু সান্ত্বনা পেলেন, আস্তে আস্তে কুসুমের মাথার ওপর হাত রাখলেন।

সে রাত্রে কিন্তু আফিমের প্রভাব সত্বেও তাঁর চোখে ঘুম এল না।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। চারিদিকে জন-মজুরের ভিড়। শহর থেকে বাঈজি আসবে, বাঈ-নাচ হবে; বাজীওয়ালা আসবে, বাজী পোড়ানো হবে। আশেপাশের গণ্যমান্য সকলের কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছে। দেওয়ান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ তদারক করছেন।

বাগানের এক পাশে গোলাপের কেয়ারি। সোমনাথ সেই দিক দিয়ে যেতে যেতে একটি রাঙা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে তার আঘ্রাণ নিল, তারপর সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে পাখির খাঁচার দিকে চলল।

খুঁটোর ওপর জাল দিয়ে ঢাকা খাঁচার মধ্যে একঝাঁক মুনিয়া পাখি খেলা করছে, ললিতা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাদের দেখছে। সোমনাথ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ললিতা বিগলিত আনন্দে বলল,—'কি সুন্দর পাখি!'

সোমনাথ গোলাপ ফুলটি তার চোখের সামনে ধরল—'আর এটা? সুন্দর নয়?'

ললিতা ফুল দেখে বলল,—'খুব সুন্দর। কিন্তু এ তো দাহুর বাগানের ফুল! কারুর হাত দেবার হুকুম নেই।'

'জানি। আমি চুরি করেছি। এখন তুমি চোরাই মাল রাখো, আমি দাহুর কাছে চললাম।'

ললিতা চোখ বিস্ফারিত করে বলল,—'দাহুর কাছে! কেন?'

সোমনাথ বলল,—'দাহুকে বলতে যাচ্ছি তুমি তাঁর গোলাপ ফুল চুরি করেছ।'

'অ্যাঁ,—না, সত্যি বল না কেন দাহুর কাছে যাচ্ছ?'

সোমনাথ গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল,—'জরুরী কাজ আছে।

জরু-রী কাজ।'

হঠাৎ হেসে উঠে ললিতার থুতনি নেড়ে দিয়ে সে চলে গেল।

কুসুম দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জলসা-মণ্ডপের নির্মাণ কার্য দেখছিল, ওদিকে একনাথ নিজের ঘরে কপালে হাত দিয়ে বসে দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাইরে উৎসবের আনন্দতৎপরতা, কিন্তু ঘরের কোণে দুর্ভাবনার উপছায়া।

কুসুম বারান্দা থেকে দেখল সোমনাথ বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। তার পদক্ষেপ এবং গতিভঙ্গিতে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা, যেন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছে। কুসুমের মন কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

সোমনাথ দোতলায় উঠে এসে একনাথের দোরে টোকা দিল—'দাদু, আসব?'

ঘরের মধ্যে একনাথ চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল তিনি আজ এক প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। একটু দম নিয়ে তিনি সহজ স্বরে ডাকলেন,—'আয়—ভেতরে আয়।'

সোমনাথ পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কুসুম বারান্দা থেকে দেখছিল, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। তার মনে অনেক রকম অস্পষ্ট উৎকণ্ঠার যাতায়াত শুরু হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে সোমনাথ একনাথের চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। একনাথ আতঙ্ক ভরা চোখে তার পানে চাইলেন। সোমনাথ বলল,—'দাদু, আপনি বলেছিলেন পাশ করলে আমাকে প্রাইজ দেবেন—'

একনাথ ভয়ার্ত চোখে চাইলেন। পঁচিশ বছর আগের আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। লোকনাথ—সে-ও প্রাইজ চেয়েছিল।

একনাথ অস্ফুট গলায় বললেন,—'প্রাইজ—অ্যাঁ—হ্যাঁ—বলেছিলাম বটে—তা তাড়া কিসের—'

সোমনাথ বলল,—'তাড়া নেই। কিন্তু আমি যে-প্রাইজ চাইব আপনি দেবেন তো?'

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন। তাঁর অসহিষ্ণু উগ্র স্বভাবে কোথায় ঘুণ ধরেছিল, হঠাৎ মড় মড় করে ধূলিসাৎ হল। তিনি সোমনাথের একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন,—'ওরে, আমি জানি তুই কি চাইবি। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা শোন। আমি বুঝতে পেরেছি তুই ললিতাকে চাস। কিন্তু এই বুড়োটার একটা কথা মন দিয়ে শোন। আমি তোর দাদা, তুই আমার নাতি—'

প্রবল আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সোমনাথ বিস্ময়ভরে চক্ষু বিস্ফারিত করে চাইল। এত বিচলিত এমন অভিভূত অবস্থায় তাঁকে সে আগে কখনো দেখেনি। উপরন্তু সে কী চায় তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কেমন করে বুঝলেন?

দোরের বাইরে মাথা নীচু করে কুসুম সব শুনছে।

সোমনাথ কোন কিছু বলার আগেই একনাথ আবার বলে উঠলেন. —'ললিতা আমার লাঠিয়ালের মেয়ে একথা তুই জানিস?'

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল,—'কেন জানব না। একথা তো সবাই জানে, আমিও গোড়া থেকে জানি। কিন্তু—'

একনাথ বাধা দিয়ে বললেন,—'থাম—আগে আমাকে বলতে দে। —তুই আমার একমাত্র নাতি, আমি তোকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তোর বাবাকেও ভালবাসতাম। সে ছিল আমার একমাত্র বংশধর, উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার কাছে নিজের ভালবাসার চেয়ে বংশের মর্যাদা ঢের বেশি বড়। এরই জন্যে আমি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম।' তাঁর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল—'মা চণ্ডী জানেন, কী নরক-যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি। কিন্তু যা করেছি বংশের জন্যে করেছি, বাপ-পিতামহের মর্যাদা রক্ষার জন্য করেছি। তাঁরা তোরও পূর্বপুরুষ, তোর জন্যে তাঁরা এই অগাধ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। তাঁদের প্রতি কি তোর কোন কর্তব্যই নেই?'

'কিন্তু দাদু—'

'আমার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শোন। তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। জানি তোরা এ যুগের ছেলে, তোদের রীতি-নীতি সবই আলাদা। তাকিয়ে দেখ, আমার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, আমার এই মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিস না।' হঠাৎ সোমনাথের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন,—'আমাকে আগে মরতে দে। ক'দিনই বা বাঁচব। তারপর তুই হবি এই সংসারের কর্তা। তখন তোর যা মন চায় করিস, কেউ তোকে বাধা দিতে আসবে না।'

শুনতে শুনতে সোমনাথের চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। একনাথ তার মুখের পানে ব্যাকুল চক্ষে চেয়ে বলে উঠলেন,—'দাদু, তুই ছাড়া আমার সংসারে আর কেউ নেই, তুই আমার একটা কথা রাখবি না?'

এবার সোমনাথ তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল, উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত অধরে বলল,—'দাদু আপনি যাতে কষ্ট পান সে-কাজ আমি কখনো করব না।'

একনাথ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, নাতিকে বুকে জাপটে নিয়ে স্খলিত স্বরে বললেন,—'বেঁচে থাক—বেঁচে থাক--'

বাইরে দাঁড়িয়ে কুসুম সব শুনল, তারপর ঠোঁট কামড়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে কুসুম দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটি গোলাপ ফুল। ললিতা বলল, –'বৌমা, আমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দাও না।'

কুসুম তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—'ওরে, কেন তোরা বড় হয়ে উঠলি, ছোট হয়েই থাকলি না কেন?'

শামিয়ানার মধ্যে নাচ-গানের আসর বসেছে। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। বাগানেও অসংখ্য গ্যাসলাইটের দীপদণ্ড। সভায় অনেক গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হয়েছে, চিকের আড়ালে মহিলাদের স্থান। একনাথ সভায় বসে রুপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন।

মধুকণ্ঠী বাঈজি লহর তুলে গান গাইছে, সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত। বাঈজির পায়ে ঘুঙুর, সে গাইতে গাইতে ঘুরে ফিরে বাহু বিলোলিত করে নাচছে। সকলের চক্ষুকর্ণ বাঈজির ওপর বিন্যস্ত।

একনাথ অলসভাবে সভার চারদিকে চোখ ফেরালেন। দেখলেন সোমনাথ সভার এক কোণে বসেছিল, কখন অলক্ষিতে উঠে গেছে। একনাথের কপালে একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল, তিনিও আস্তে আস্তে উঠে সভার বাইরে গেলেন। সবাই বাঈজির সঙ্গীতসুধা পানে মোহাচ্ছন্ন, কেউ লক্ষ্য করল না।

বাগানের কোণে পাখির ঘরের ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ললিতা আর সোমনাথের কথা হচ্ছিল। দূর থেকে গ্যাসলাইটের ঝিলমিল আলো তাদের মুখের ওপর খেলা করছে। সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে ব্যগ্রস্বরে বলছিল,—'এই উৎসব—নাচ গান—এসব আমার কাছে অর্থহীন—আমি তোমাকে চাই—ললি, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু দাদু—'

একনাথ ঝোপের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন। ললিতা বলছে,—'দাদু আমাকে চান না।'

সোমনাথ বলল,—'ললি, তুমি দাদুকে ভুল বুঝো না। তিনি সাবেক কালের মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মতন নয়। কিন্তু তিনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, আমি তাঁকে আর দুঃখ দিতে পারব না। দাদুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন আমি তোমাকে বিয়ে করব না।'

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই, দূর থেকে বাঈজির গানের কলি ভেসে আসছে। একনাথ উৎকর্ণ হয়ে আছেন।

শেষে সোমনাথ বলল,—'তুমি জানো, দাদু আমাকে কত ভালবাসেন। আমি যদি তাঁর কথা না শুনি, তিনি হয়তো মারা যাবেন···সে আমি পারব না। আর ক'দিনই বা তিনি বাঁচবেন। ললি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

কান্নাভরা গলায় ললিতা বলল,—'পারছি।'

'আমরা দু'জনে এক বাড়িতেই থাকব, কিন্তু দূরে দূরে থাকব। আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'না।'

একনাথ আর সেখানে দাঁড়ালেন না, যেমন চুপিচুপি এসেছিলেন তেমনি চুপিচুপি ফিরে গেলেন।

রাত্রির উৎসব শেষ হয়েছে, আলো নিভে গেছে, যারা উৎসবে যোগ দিয়েছিল, সকলে চলে গেছে। উৎসব-মণ্ডপ অন্ধকারে আবৃত হয়ে শূন্য পড়ে আছে।

বাড়িও সুষুপ্ত অন্ধকার। কেবল একনাথ জেগে আছেন। তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। তিনি নিজের ঘরে একাকী পায়চারি করছেন। পায়চারি করতে করতে কখনো তিনি পালঙ্কের পাশে বসছেন, কখনো চেয়ারে বসছেন। তাঁর মন যেন ঝড়ের সমুদ্রে ওঠা-পড়া করছে।

সকাল হল, রোদ উঠল। একনাথ স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে চেয়ারে এসে বসলেন। বেশ প্রশান্ত মূর্তি, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। গোবর্ধন আফিমের কৌটো ও জলের গেলাস নিয়ে অপেক্ষা করছিল, চেয়ারের পাশে টিপাইয়ের ওপর জলের গেলাস রাখল। একনাথ আফিমের কৌটো খুলে গুলি পাকাতে পাকাতে বললেন,— 'গোবর্ধন, তুই যা, ডাক্তার পাণ্ডেকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।'

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন চোখে একবার তাঁর পানে তাকাল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না, 'আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

আধঘণ্টা পরে ব্যাগ হাতে ডাক্তার এলেন। হাসিমুখে বললেন,— 'কাল রাত্রে মজলিশ খুব জমেছিল। আপনি তো ন'টা বাজতে না বাজতেই উঠে গেলেন।—কি ব্যাপার বলুন তো, ঠাণ্ডা লেগে গেছে নাকি?'

একনাথ বললেন,—'না, ঠাণ্ডা লাগেনি। বোস, বলছি।'

ডাক্তার বসলেন। একনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললেন,—

'ডাক্তার, আমার শরীরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা কর দেখি। আমি জানতে চাই আর কতদিন বাঁচব।'

ডাক্তার হেসে বললেন,—'এখনো অনেক দিন বাঁচবেন। গত কয়েক বছর আপনার তো সর্দি-কাসি পর্যন্ত হয়নি। আপনারা দীর্ঘায়ুর বংশ, এরই মধ্যে মৃত্যুচিন্তা কেন?'

একনাথ বললেন,—'দীর্ঘায়ুর বংশ হলেও সবাই তো সমান বাঁচে না। আমার ঠাকুর্দা তিরানব্বুই বছর বেঁচে ছিলেন, বাবা উনআশিতেই গিয়েছিলেন, আর লোকনাথ—। কিন্তু যাক। তুমি একবার পরীক্ষা কর।'

'একবার কেন, দশবার করব। কিন্তু আমি আপনার ধাত জানি, আশঙ্কার কোন কারণ নেই।'

'আশঙ্কার—কারণ—নেই। হুঁ।' একনাথ একবার ডাক্তারের মুখের পানে চাইলেন। ডাক্তার কি করে বুঝবে তাঁর মনের গোপন কথা!

তারপর ডাক্তার প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করলেন একনাথের শরীর। বুক পেট হৃদ্‌যন্ত্র ফুসফুস রক্তচাপ সব দেখলেন। লোহার ভাঁটার মত নিরেট শরীর, কোথাও দুর্বলতার চিহ্ন নেই।

লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাণ্ডে বললেন,—'আপনার বয়স কত জানি, তিয়াত্তর বছর। কিন্তু শরীরটা পঞ্চাশ বছরেই আটকে গেছে, আর বাড়েনি।'

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন,—'হেঁয়ালি কোরো না, পষ্ট করে বলো আর কতদিন বাঁচব।'

ডাক্তারের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল,—'যদি আত্মহত্যা না করেন, এখনো পনেরো-কুড়ি বছর বাঁচবেন।'

'পনেরো-কুড়ি বছর!' বলতে বলতে একনাথের নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, তিনি যেন বিভীষিকা দেখছেন এমনি ভাবে চেয়ে রইলেন—

'আরো পনেরো-কুড়ি বছর বেঁচে থাকব।'

ডাক্তার ব্যাগের মধ্যে যন্ত্রপাতি ভরতে ভরতে বললেন,—'তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিস করি বটে, কিন্তু একেবারে হেতুড়ে ডাক্তার নই। আমার কথা বিশ্বাস না করেন, শহর থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন—আচ্ছা চলি এখন, অনেকগুলো রুগীকে ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি।' তিনি ব্যাগ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ একনাথ অসাড় বসে রইলেন, তারপর উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মাথার মধ্যে চিন্তার বিষক্রিয়া চলতে লাগল—পনেরো-কুড়ি বছর · তখন দাদুর বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ·· না না, এ হতে পারে না···কিন্তু—বংশের অমর্যাদা আমি নিজের চোখে দেখব? না না, এ হতে পারে না···'

সন্ধ্যের সময় একনাথ সোমনাথের দোরে টোকা দিলেন,—'দাদু, ঘরে আছিস?'

সোমনাথ ঘরে একলা বসে ধূসর ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলল,—'এই যে দাদু।'

সোমনাথ বেরিয়ে এল। একনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'চল আমার ঘরে, এক দান দাবায় বসা যাক। সেদিন তুই আমায় মাৎ করেছিলি, আজ আমি তোকে মাৎ করব। এমন মাৎ করব যে চিরদিন মনে থাকবে।'

সোমনাথ মুখে হাসি এনে বলল,—'বেশ তো দাদু, বেশ তো। দেখা যাক কে কাকে মাৎ করে।'

একনাথের ঘরে গিয়ে সোমনাথ দেখল বিস্তীর্ণ পালঙ্কের মাঝখানে দাবার বোর্ড পেতে ঘুঁটি বসানো হয়েছে। তখনো দিনের আলো একটু ছিল। একনাথ পালঙ্কের শিয়রের দিকে বসে হাঁক দিলেন—'গোবর্ধন!'

গোবর্ধন এসে দাঁড়াল,—'আজ্ঞে?'

'আলো দে। আর আমার আফিম রেখে যা।'

'আজ্ঞে।' গোবর্ধন চলে গেল।

সোমনাথ খাটের ওপর বসল। আধা-অন্ধকারে খেলা আরম্ভ হল। তারপর গোবর্ধন আলো এনে টিপাইয়ের মাথায় রাখল, দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো নিল, গেলাসে জল ঢেলে একনাথের হাতের কাছে রেখে চলে যাচ্ছিল, একনাথ বললেন,—'ভাল কথা, গোবর্ধন, দাদুর পাস করার জন্যে তোকে বকশিস করা হয়নি।—এই নে।' ফতুয়ার পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট নিয়ে তিনি গোবর্ধনের হাতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

গোবর্ধন নোটের তাড়া দেখে ঘাবড়ে গেল, বিহ্বল ভাবে একবার নোটের পানে একবার একনাথের পানে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল,—'বাবু, এ যে অনেক টাকা—!'

একনাথ দাবার ছক থেকে চোখ তুললেন না, হাত নেড়ে তাকে বিদেয় করলেন। সোমনাথের মন খেলায় নিবিষ্ট, সে কিছু লক্ষ্য করল না।

কিছুক্ষণ নীরবে খেলা চলল। কয়েক চাল পরে একনাথ নিজের ঘোড়াকে আড়াই ঘর এগিয়ে সোমনাথের রাজার সামনে বসালেন, বললেন,—'কিস্তি।'

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সোমনাথ গলার মধ্যে শব্দ করল,—'হুম।' একনাথ হাসি হাসি গলায় বললেন,—'কেমন বেড়াজালে পড়েছিস! চাল খুঁজে পাচ্ছিস না।'

সোমনাথ উত্তর দিল না, বোর্ডের ওপর ঝুঁকে একমনে চাল ভাবতে লাগল। একনাথ তীক্ষ্ণচোখে তার পানে চাইলেন, তারপর আফিমের কৌটো তুলে নিয়ে কৌটো খুলে সমস্ত আফিম মুখে দিলেন। কৌটোয় প্রায় দেড় ভরি আফিম ছিল।

একঢোঁক জলের সাহায্যে আফিম গলাধঃকরণ করে একনাথ বিজয়ীর চোখে নাতির পানে চাইলেন, বললেন,—'তোরা আজকালকার ছেলেরা খুবই চালাক-চতুর, কিন্তু আমরা বুড়োরাও বড় কম যাই না, এখনো তোদের হারাতে পারি।—ভাল কথা, ডাক্তার আজ একটা ভারি দামী কথা বলেছিল। বলেছিল, যদি আত্মহত্যা না করি, পনের-কুড়ি বছর

বাঁচব—হাঃ হাঃ হাঃ! এই আংটিটা রাখ, ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি।' নিজের আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে তিনি সোমনাথের দিকে এগিয়ে ধরলেন—'এই নে।'

সোমনাথের তখন 'কাদের সাপ' অবস্থা। সে অন্যমনস্ক ভাবে আংটি নিয়ে বলল,—'আংটি—কি হবে?'

একনাথ বললেন,—'ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি—আমার উপহার।'

'ও—আচ্ছা—' আংটি পকেটে রেখে সোমনাথ আবার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ খেলা চলার পর, একনাথ পিছনের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। তাঁর ঘুম আসছে, ঘুমের জোয়ারে তাঁর চেতনা যেন ডুবে যাচ্ছে। সম্মুখে শান্তি পারাবার—

'দাদু' এবার আপনার চাল।'

একনাথ চোখ টেনে টেনে চাইলেন, তারপর উঠে বসে ছকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি গলার মধ্যে হাসির মতন একটা শব্দ করলেন, কম্পিত হাতে নিজের মন্ত্রী কোণাচে ভাবে দু'ঘর এগিয়ে দিয়ে বললেন,—'কিস্তি—মাৎ। দাদু, তুই হেরে গেলি।'

একনাথ পিছনের তাকিয়ার ওপর আবার এলিয়ে পড়লেন, আফিমের শূন্য কৌটো হাত থেকে স্খলিত হয়ে বিছানায় পড়ল।

সোমনাথ বোর্ড থেকে চোখ তুলে লজ্জিত ভাবে একনাথের পানে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। একনাথের এলিয়ে পড়ার ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়।

সোমনাথ বলে উঠল,—'দাদু। কী হয়েছে?'

একনাথ সাড়া দিলেন না। সোমনাথ তখন উঠে গিয়ে তাঁর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকল,—'দাদু! দাদু!'

এবারও একনাথের কাছ থেকে সাড়া এল না। সোমনাথ স্তম্ভিত ভাবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার চোখে পড়ল আফিমের কৌটোর ওপর। সে সেটা তুলে নিয়ে দেখল, কৌটো শূন্য। সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল,—'এ আপনি কি করলেন দাদু।' তারপর চিৎকার

করে উঠল,—'গোবর-দা, গোবর-দা, শীগ্‌গির এস।'

গোবর্ধন ছুটে এল। সোমনাথ তাকে বলল,—'যাও শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। জলদি—জলদি।—দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!'

গোবর্ধন একবার একনাথের পানে চাইল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ভাবে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে ললিতা।

কুসুম উৎকণ্ঠা ভরা গলায় বলল,—'কী হয়েছে—কী হয়েছে সোমনাথ?'

সোমনাথ প্রায় কেঁদে উঠল,—'মা, সর্বনাশ হয়েছে—দাদু—এই ছাখো।' সে আফিমের শূন্য কৌটো খুলে দেখাল। কুসুম তাই দেখে হু হু শব্দে কেঁদে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'অ্যাঁ এ কি হল! মা চণ্ডী, তুমি এ কি করলে—!'

ললিতা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। ঘরে কয়েকটা বড় বড় ল্যাম্প জ্বালা হয়েছে। একনাথের দেহ খাটের ওপর লম্বা ভাবে শোয়ানো হয়েছে। গোবর্ধন তাঁর পায়ের ওপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ডাক্তার পাণ্ডে খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চেয়ে আছেন, তাঁর মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। পাশে কুসুম আর ললিতা পরস্পরকে যেন আগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের পায়ের কাছে সোমনাথ, তার চোখে মাঝে মাঝে জল উথলে উঠছে। সে কাপড়ের খুটে চোখ মুচছে। ঘরে এই পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই।

অবশেষে সোমনাথ ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,—'আমরা যাতে সুখী হই তাই তুমি এভাবে চলে গেলে। দাদু, হেরে গিয়েও তুমি মাথা নীচু করলে না। তুমিই সত্যিকার অভিজাতক। ভগবান তোমায় শান্তি দিন।'

দুই বন্ধু—অজয় আর সমর। যারা দেখে, তারাই বলে, 'আহা, যেন এক বৃন্তে, দুটি ফুল, উপমাটা নিতান্ত সাবেকী। অজয় আর সমর হাসে। কৃপার হাসি। বন্ধুত্বটা তাদের হাওয়ার দোলায় দুলে শুধু বাগানের শোভা বর্ধনই করে না ; শেকড় তার মাটির অনেক গভীরে। ক্লাস ফাইভে একদিন তারা প'ড়ল ঃ উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

পেছনের বেঞ্চে বসে এখনই সমর পকেট থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরি-খানা বার করল। পেন্সিল-কাটা করেই কাটল বাঁ-হাতের তর্জনি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। শিউরে উঠল অজয়। সমরের মুখে কিন্তু অমলিন হাসি। ধীর কণ্ঠে বলল, চাণক্য পণ্ডিত বাজে-বাজেই লেখেননি রে। রক্ত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে, রাজদ্বারে—যেখানেই হোক, আমরা কেউ কাউকে ফেলে পালাব না। একজন আর একজনের পাশে এসে দাঁড়াব।

প্রতিজ্ঞা করল অজয়। মনে বিচিত্র এক উত্তেজনা, রক্তে উন্মাদনার ঢেউ। সেদিন অলক্ষ্যে বসে বিধাতা বোধ করি হাসলেন।

স্কুলের গণ্ডী একসঙ্গেই পেরোল তারা। ভর্তি হল একই কলেজে। অবশ্য অজয় নিল কমার্স। তার বাপ রমেন সেনের বিরাট সওদাগরী অফিস। ফলাও ব্যবসা। ভবিষ্যতে অজয়কে বাপের শূন্য সিংহাসনে বসতে হবে। আর সমর গিয়ে ভর্তি হল সায়েন্স ক্লাসে। ডাক্তার হতে হবে তাকে। আগ্রহ তার নিজের যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি তার অভিভাবকদের।

যে ধারা এতকাল ছিল একমুখী, তাই হল দ্বিমুখী। চাণক্য পণ্ডিত বন্ধুর যাচাইয়ের যে কষ্টিপাথর রেখে গেছেন, তাতে যেন প্রথম চিড় দেখা দিল।

দিল উৎসবে, ব্যসনে। অজয় সান্ধ্য ক্লাসে পড়ে। সমরের ক্লাস সকালে। তাই ছুটিছাটা বা রবিবার ছাড়া দেখাসাক্ষাৎ তাদের বিরল হয়ে উঠল। অজয়দের বাড়ির অত বড় বার্ষিক উৎসবে সমর যেতেই পারল না। সন্ধ্যায় নিত্য সাউথ ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলাও অজয়কে

বন্ধ করে দিতে হল।

হোক, তবু এমনি ভাবে হোঁচট খেতে খেতে তারা ছাত্রজীবন পার হল।

এর পর সংসার জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের বুকে দেখা দেওয়া চিড়টা আরও অনেকখানি বেড়ে গেল।

পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের বাপ ছেলেকে অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একা বোধ করি সব দিক আর সামলাতে পারছিলেন না তিনি। মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল অজয়, আর ক'টা দিন যাক্ না বাবা। সমর ডাক্তারীটা পাশ করে বেরুক···

থামিয়ে দিয়েছিলেন রমেন সেন। চোখের চশমাটা নামিয়ে রেখে কতক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন ; বলেছিলেন, আজকের দিনে বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ জাহির করে না। আসলে ওটা একজাতীয় আত্মসচেতনতা। দায়িত্ব এড়ানোর মনোবৃত্তিও বলতে পারো।

এর পর অজয় আর একটি কথাও বলেনি। পরদিন থেকেই গলায় টাই এঁটে, সাড়ে ন-টার সময় অফিসে হাজিরা দিতে শুরু করল।

তবু অবসর পেলেই সে ছুটে আসত সমরের হোস্টেলে। তার ঘরে ঢুকে খোলা বইপত্তরগুলো গুটিয়ে দিত। হুকুম করত, চা আনা, খাবার আনা। আলোটা নিভিয়ে দে। তারপরই এখানে তক্তাপোশটার ওপর সবশুদ্ধ গড়িয়ে পড়ে বলত, ডি. ই. আর ডি. টি-তে কোন তফাৎ নেই রে। জীবনে ছুটোই মারাত্মক ব্যাধি

সমর কথা বরাবরই কম বলে। আত্মবিশ্বাসটা বেশি বলেই সব রকমের হৈচৈ এড়িয়ে চলে। খাবার সে সেদিনও আনাল, প্রচুর পরিমাণেই আনাল। নিজের হাতে চা তৈরি করে বন্ধুকে দিল ; কিন্তু আলো নেভাল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, ভুলে যাসনি, সামনে আমার এগজামিন।

ধড়মড় করে উঠে বসল অজয়। চা আর খাবারের সদ্‌গতি করতে করতে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল, নদীর একপাড় ভাঙে, আর

একপাড় জাগে, জানিস তো! তোর জন্যেই হয়তো এর পর বিয়ে করে বসব।

সমরের ঠোঁটের কোণে শুধু একটু হাসি দেখা গেল। কোন কথা বলল না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অজয় শাসনের সুরে বলল, তোর এই Introvert স্বভাবটা ছাড় সমর, নইলে রুগীর গায়ে যে ছুরি বসিয়ে হাত পাকাচ্ছিস, সেই ছুরিই একদিন নিজের বুকেই বসাবি।

মচ্‌মচ্‌ করে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল সে।

হেসে সমর গুটানো বইটা আবার তুলে নিল। এমন অভিযোগ অজয় বহুবার করেছে, কিন্তু সে জানে, হওয়ার মুখে পাল তুলে দিলে, জীবনতরী তার ঠিক ঘাটটিতে কোনদিনই ভিড়বে না। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে শক্ত হাতে দাঁড় টানতে হবে। প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে তিলে তিলে এগোতে হবে। অতি বড় প্রয়োজনের মুহূর্তেও কেউ গুন্‌ টেনে কূলে ভেড়াবে না।

অবশেষে একদিন সে ডাক্তার হয়ে বেরোল। শল্য চিকিৎসক। অস্ত্রোপচার করত সে সাবলীল ভঙ্গিতে, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। যেটুকু সুনাম সে পেয়েছিল, সেইটুকু মূলধন নিয়েই শহরের প্রাণচঞ্চল পাড়ায় এক চেম্বার খুলে বসল। দরজার পাশেই নেমপ্লেট আঁটল, সমর রায়, সার্জেন।

মেধাবী ছাত্র ছিল সে। বছরের পর বছর পরীক্ষার ফল যত ভাল হয়েছে, আত্মবিশ্বাসও গেছে সেই অনুপাতে বেড়ে। রোগীর আশায় নিয়ম-মাফিক চেম্বারে বসে থাকতে থাকতে কোনদিন সে হতাশায় ভেঙে পড়েনি।

হাত ধরে পশারের তোরণদ্বারে পৌঁছে দেবে, এমন কোন শুভানুধ্যায়ী তার ছিল না। ভিড়ের মাঝে হারিয়েও গেল না সে।

না-যাবার সব কৃতিত্বটুকু তার নিজেরই। চিকিৎসাটাকে সে একান্ত পেশাদার বৃত্তি করে তোলেনি। রোগীর পকেটের দিকে না তাকিয়ে, রোগের জড় ধরেই টান দিত সে। কথা বলত কম, ব্যবহারে থাকত প্রশান্ত হাসির বরাভয়।

তাই একবার যে রুগী আসত, সে দ্বিতীয়বার আসতে দ্বিধা তো করতই না; বরং আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ডাক্তার রায়কে দিয়ে দেখাতে সুপারিশ করত।

নিন্দার মত প্রশংসাটাও বুঝি দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়ে। নইলে সকাল সন্ধ্যায় সমরের চেম্বারে রোগীর ভিড় বাড়তেই বা থাকবে কেন? নিয়মানুবর্তিতার বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। বিশ্রামের অবকাশ গেল কমে। সব দিন সময়মত সমরের খাওয়াও হয় না। রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয় টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে।

অজয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটাও বিরল হয়ে উঠল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বন্ধুত্বের স্রোতে এবার ভাটার টান ধরেছে।

অফিস থেকে অজয় মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলে অনুযোগ করে, নালিশ জানায়; তারপর হঠাৎই একদিন রাত্রে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হয় সমরের চেম্বারে। অভিমানের বাঁকা সুরে বলে, পর্বত তো গেল না, তাই মহম্মদকেই ছুটে আসতে হল।

অভ্যর্থনায় সমরের অকারণ উচ্ছ্বাস থাকে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে পেশার জোয়ালটাকে নামিয়ে ফেলতে দেরি হয় না তার। সামনাসামনি গদীমোড়া চেয়ারে বসে তারা শুরু করে দেয় খোসগল্প। পেয়ালার পর পেয়ালা কফি আনে ভৃত্য রামলগন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। খোসগল্প একসময় এসে দাঁড়ায় স্মৃতিচারণে। তারপর রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, অর্থনীতি থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিজেদের অগোচরেই পরিক্রমা করে চলে তারা। মাঝে মাঝে তর্ক তাদের উদ্দাম হয়ে ওঠে। বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না অজয়ের। অবশেষে ভোরের আলো জানালার শার্সি দিয়ে দেখা গেলে সমর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আর নয়, বাড়ি যা অজয়। চান করে এবার আমায় চেম্বারে বসতে হবে। ন-টায় একটা অপারেশন।

অজয়ের হুশ হয়। রাত জাগার ক্লান্তিটা এতক্ষণে যেন সর্বাঙ্গ ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ে। অবসন্ন দেহটা টানতে টানতে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে, আর তখনই দেখা যায় শুভ্রবসনা মায়াকে ওপরে উঠতে।

মায়া মানে কুমারী মায়া দে। নার্স। সমরের ক্লিনিকে কাজ করে। আগে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল। সমরের সঙ্গে পরিচয়টা সেইখান থেকেই।

ডিউটি দিতে যেতে হত সমরকে। আরও অনেক ছাত্রই যেত; কিন্তু রোগীদের ওপর তার দরদ, রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা, মিষ্টি মধুর ব্যবহার চুম্বকের মতই টানত মায়াকে।

সহকর্মিনীদের কাছে সেটা বেশিদিন গোপন থাকেনি। সুযোগ পেলেই তারা ঠাট্টা করত, বিদ্রূপ করত, শ্লেষের চাবুক চালাত। শেফালি নাগই ও ব্যাপারে বোধ করি সবচেয়ে নির্মম ছিল। একটা দিনের কথা মায়া কখনও ভুলতে পারবে না। রাতের ডিউটি ছিল মায়ার আর সমরের। সারাক্ষণের মধ্যে একটিবারও তারা একান্ত হয়নি, অকারণে বাক্যবিনিময়ও করেনি; শুধু বারদুয়েক সমরের চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল।

অনাস্বাদিত এক পুলকে ভরে উঠেছিল মায়ার সারা অন্তর। সেইটুকু সঞ্চয় নিয়েই সে ফিরেছিল হোস্টেলে।

সামনের দালানটায় তখন চায়ের কাপ নিয়ে মজলিশ চলছিল। শেফালি নাগ তাকে দেখে টেনে টেনে বলে উঠেছিল, আহা! মায়ার আমাদের ধর্মে পাপ সয় না। আমরা ভাই পাপী-তাপী মানুষ। মনের মানুষ পেলেই লেপটে থাকি। 'প্লেটনিক লভে'র কি বুঝব, বল!

সব ক'জনের কণ্ঠে হাসির জলতরঙ্গ বেজেছিল। লজ্জা অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে মায়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে আত্ম-গোপন করেছিল।

আর একদিন ধরেছিল দীপা চৌধুরী। ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা আসন্ন। পাশ যে সমর করবে, ভালভাবেই করবে, তাতে কারোই সন্দেহ ছিল না। সেইটে উপলক্ষ্য করেই দীপা নিরীহের ভঙ্গিতে মায়াকে প্রশ্ন করেছিল, এবার কি করবি? ঘুঘুর বাসা তো পুড়তে চলল!

মায়া কোন জবাব দেবার আগেই শেফালি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিল,

না ভাই মায়া, শেষ ক'টা দিন তুই এমন ভাবে সমর রায়ের বুক জুড়ে থাক, যাতে ও ফেল করে। তবু তো ছ'টা মাস বিরহের কান্না কাঁদতে হবে না!

মায়ার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। ছুটে নিজের ঘরে এসে সে আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিল, ভগবান, সমরবাবু যেন পাশ করেন। সারা জীবন যদি আমার সঙ্গে দেখা না হয় সেও সইবে, কিন্তু —

সমর অবশ্য পাশ করল। ভালভাবেই করল। শীর্ষস্থানে নাম তার।

তারপর ঘনিয়ে এল বিদায় নেবার দিন। চেষ্টা করেও মায়া চোখের জল গোপন করতে পারল না। সমরের একখানা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি এখন কি করব, ডাক্তার রায়? আপনি যতদিন কাছাকাছি ছিলেন, নিজেকে যে কতখানি নিরাপদ ভাবতুম, এর পর—এর পর—হয়তো—নেকড়ের পাল··। গলাটা তার বাষ্প-ভারে বুজে এল।

সেদিন সমর শুধু সান্ত্বনাই দিতে পেরেছিল, নির্ভয় করতে পারেনি।

তারপর সে নিজের চেম্বার খুলল। দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় একটু মাটি পেতেই সোজা মায়ার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, আমার ক্লিনিকের জন্যে একজন নার্স তো লাগবেই। যদি ইচ্ছে করেন, চলে আসতে পারেন। অবশ্য মাইনে এখন বেশি দিতে পারব না। কোন রকমে থাকা-খাওয়াটা চলে যাবে, এই আর কি!

এতখানি সৌভাগ্যের কথা মায়া বোধ করি কল্পনাও করতে পারেনি। কাঁপা গলায় বলল, মাইনের কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন ডাক্তার রায়? আপনার যা খুশি দেবেন। মোটে না দিলেও আমার আপত্তি নেই। হাতে যা আছে, তাতে কিছুদিন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। শুধু এই নরককুণ্ড থেকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে চলুন।

পরদিনই মায়া হাসপাতালের চাকরিতে ইস্তফা দিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সমরের মতই চেম্বারের এক কোণে তার নীড় রচনা করতে

পারল না। শুধু যে সঙ্কোচে বাধল, তাই নয়; সমাজের চোখেও সেটা বিসদৃশ।

তবু কতটুকুই বা হোস্টেলে থাকত সে? সকালে এসে যখন হাজিরা দিত, তখনও শহরে প্রাণের সাড়া জাগত না। ফিরত একেবারে গভীর রাতে। কর্মচঞ্চল শহর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে সব সময়ই কিছু ক্লিনিকের কাজ থাকত না; তবু বসে থাকত না মায়া। সমরের প্রত্যেকটি বই ঝেড়ে-মুছে আলমারিতে সাজিয়ে রাখত, ঘরের কোন কোণে এতটুকুও ঝুল আছে কিনা ঘুরে ফিরে নিরীক্ষণ করত, ফাঁক পেলে সমরের চাকরটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ভালমন্দ রাঁধতে বসত।

মাঝে মধ্যে হঠাৎ অসময়ে ফিরে আসায় সমরের নজরে সেগুলো পড়েছে। মৃদু তিরস্কারও করেছে মায়াকে, অব্যাপারেষু্তে লাভ নেই, মিস দে। হাতে কাজ না থাকে, পড়াশুনোও তো করতে পারেন।

কোন জবাব দিত না মায়া। ধীরে ধীরে সরে যেত তার সামনে থেকে।

ছ'টা মাস এমনি ভাবেই পার হয়ে গেল। এই ছ'মাসে চেম্বারে রোগীর ভিড় বেড়েছে, সমরের বিশ্রামের অবকাশ কমেছে, সেই সঙ্গে তার দুই চোখে দেখা গেছে নতুন এক আলো।

হ্যাঁ, সমর ভালবেসেছে। ভালবেসেছে লীলা দত্তকে। তাদেরই পাড়ার এক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীর মেয়ে। বছর বাইশ বয়েস। শিক্ষিতা, সুন্দরী, আধুনিক সমাজের মক্ষিরাণী।

প্রথম দেখাটা দত্তবাড়িতেই। কল পেয়ে রোগী দেখতে গিয়েছিল সমর। রোগীর সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন সে করেছিল, লীলাকেই তার জবাব দিতে হয়েছিল। অপূর্ব ভঙ্গি তার কথা বলার, ব্যবহার নিরহঙ্কার, মিষ্টিমধুর; তাই পেশার ডাক যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন নেশার হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারল না।

তরুণ সার্জেনকে লীলারও ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল তার সহজ সরল ব্যবহার, নির্ভীক মতামত, বলিষ্ঠ জীবন দর্শন।

তাই অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছিল। প্রথম প্রথম চায়ের নিমন্ত্রণ; তারপর বাড়িরই লনে টেনিস খেলায় যোগদানের অনুরোধ।

সমর সাগ্রহেই সাড়া দিয়েছিল। দত্তবাড়ির আসরে সে এখন প্রায় নিত্য অতিথি। তার চোখে নতুন আলো দেখে মায়া যেটা অনুমান করেছিল, সেটাই স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল সমরকে সেদিন র‍্যাকেট হাতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। বিস্মিত হয়েছিল বৈকি মায়া; কিন্তু তার ধাক্কাটা এমনই আচমকা যে সে একটি কথাও বলতে পারেনি।

সমর বোধ করি সেটা লক্ষ্য করেছিল। হালকা সুরেই বলেছিল, ডাক্তারদেরও সময় সময় নিজের চিকিৎসার দরকার। দেহের না হলেও, মনের, কি বলেন?

মায়া নীরবে শুধু ঘাড় নেড়েছিল।

শুনুন, যদি কেউ আসে, বা আমাকে আপনার দরকার হয়, হয়তো হবে না, তবু একটা ফোন নম্বর লিখে নিন। আমায় রিং করে দেবেন।

লীলাদের বাড়ির ফোন নম্বর দিয়েছিল সে। আর খাতার পাতায় সেটা টুকে নিয়েছিল মায়া।

যেতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সমর। কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা, নার্সের জীবন ছাড়া কি আপনার আলাদা জীবন নেই মিস দে? নার্সের পোশাক ছাড়া আটপৌরে শাড়ির কথা বলছি।

বুকের ভেতর দুরদুর করে উঠেছিল মায়ার। এক ঝলক রক্ত দেখা দিয়েছিল দুই গালে।

নতুনতর কৌতুকে সমরের দুই চোখ নেচে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, কোনদিন কাউকে ভালবাসেননি?

ভীরু চোখ তুলে মায়া তাকাতে গিয়েও পারেনি। মুখ ফিরিয়ে কাঁপা গলায় জবাব দিয়েছিল, না ডাক্তার রায়।

তাহলে আর দেরি করবেন না। কাউকে হৃদয় দান করে ফেলুন! বুঝবেন কি অপূর্ব সে অভিজ্ঞতা! আচ্ছা, চলি আমি।

ভরা মনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সে, আর দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মায়া। সে জানে সমর কোথায় যাচ্ছে। টেলিফোনটা যে দত্তবাড়ির সেটাও তার অজানা নয়। আর দত্ত সাহেবের মেয়ে লীলা। তাকেও দেখেছে মায়া। দেখেছে সমরেরই চেম্বারে, দত্ত সাহেবের গাড়িতে বারকয়েক। সত্যই সুন্দরী সে, শিক্ষিতাও নিশ্চয়।

উদ্‌গত নিশ্বাসটা গোপন করল মায়া।

টেনিসের শেষে লীলার সঙ্গে সমর এসে দূরের বেঞ্চটায় বসল বিশ্রামের জন্যে। পরিশ্রমে তখনও তাদের মুখে রক্তাভা, নিশ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত। চোখে অপরাহ্ণের আলোয় দেখা যাচ্ছিল বিচিত্র এক মদিরতা।

সমর ভাবছিল আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। লীলার কাছে সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাব করবে সে। কিন্তু সুযোগ মিলল না। তার আগেই একজন ভৃত্য এসে জানাল, আপনার টেলিফোন ডাক্তারবাবু। আমি ভদ্রমহিলাকে ধরে রাখতে বলেছি।

নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই সমরকে উঠে দাঁড়াতে হয়। লীলা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তোমার নার্সটিই করছেন বোধহয়। তার মানেই তোমার এখনি ছুটতে হবে। আমি ভেবেছিলুম কোথায় ব্রিজ নিয়ে বসা যাবে!

সে-লোভ সমরের নিজেরও বড় কম ছিল না; তবু যেতেই হয়। রিসিভারটা তুলে নিয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠেই ডাকল, হ্যালো!

ওপার থেকে ভেসে এল মায়ার সঙ্কুচিত কণ্ঠ, আমি মায়া বলছি। অজয়বাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কি একটা জরুরি কথা আছে। অবশ্য আপনার যদি কোন ক্ষতি না হয়—

যাচ্ছি। ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন। রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আবার যখন সমর লীলার কাছে ফিরে এল, মুখখানা তখন তার অপ্রসন্নতায় থমথম করছে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলল, আমাকে ক্লিনিকে একবার যেতেই হবে। এক বন্ধু সেখানে—

বাধা দিয়ে লীলা বলে উঠল, শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে। আবার ফিরে আসবে তো? তোমায় ছেড়ে দিতে একেবারে ইচ্ছে করছে না।

সমরের বুকের ভেতর রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। কি উত্তর দেবে চট্ করে ভেবে পেল না।

লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি, জবাব দিচ্ছ না কেন?

ততক্ষণে একটা পথ সমর আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেটাই আন্তরিক কণ্ঠে ব্যক্ত করল, চেষ্টা কয়ব—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। সঙ্গে যদি বন্ধুটি আসতে চান, অসুবিধে হবে কি?

ছি ছি! কি বলছ তুমি? নিশ্চয় নিয়ে আসবে।

অনেকখানি নিশ্চিত হল সমর।

তার সঙ্গে যেতে যেতে লীলা প্রশ্ন করল, তোমার বন্ধুটিও কি ডাক্তার?

না। 'সেন য়্যাণ্ড সন' বিজনেস ফার্মের নাম হয়তো শুনে থাকবে। অজয় হচ্ছে সেই সেন য়্যাণ্ড সনের সন।

খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল লীলা। সমরের মনে হল বেলোয়ারি ঝাড়ে অকস্মাৎই ঝড়ের দোলা লাগল। বুকের ভেতরও সেই ঝড়ের মাতন। সংক্ষেপে বিদায় নিয়ে সে দ্রুত পা চালাল।

চেম্বারে অজয় অপেক্ষা করছিল ঠিকই; কিন্তু সমরকে ফিরিয়ে আনার তাগিদ সে সত্যিই দেয়নি। সমর বেরিয়ে গেছে শুনে স্বাভাবিক কৌতূহলেই মায়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় গেল এমন অসময়ে? পেশাদার কলে?

ইতস্তত করে মায়া জবাব দিয়েছিল, আমি ঠিক জানি না, মিস্টার সেন—তবে—তবে মনে হয় না—

তার ভঙ্গি দেখে অবাক হয়েছিল অজয়। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠেছিল, তবে? আজকাল কি ও সামাজিক জীব হয়ে গেল নাকি?

কোথায় যেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—

খবরটা শুনেও অজয় যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিল, আচ্ছা চলি। তাকে বলবেন, সুবিধে মতন আবার একদিন আসব'খন।

ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই মায়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিল,

না, না, যাবেন না মিস্টার সেন। আমি জানি তিনি কোথায় গেছেন। এক্ষুনি তাঁকে ফোন করে দিচ্ছি।

বাধা দেবার অবসরও পায়নি অজয়। এমন কোন জরুরি কাজ নেই এটুকু বলবার সুযোগও মায়া তাকে দেয়নি। ছুটে গিয়ে সমরের দিয়ে যাওয়া নম্বরটা ডায়াল করতে শুরু করে দিয়েছিল।

সমর এসে পৌঁছল। তার কর্তব্য পালন যেন শেষ হয়েছে, এমনই ভঙ্গিতে মায়া নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গেল।

অজয় ক্ষমা ভিক্ষার সুরে বলল, বিশ্বাস কর ভাই, আমি ঠিক টেনে আনতে তোকে চাইনি। জানি তো, তোদের মত জহ্লাদের ভাগ্যে আমোদ আহ্লাদের শিকে কদাচিৎই ছেঁড়ে।

বিশেষজ্ঞর চোখ দিয়ে সমর তখন অজয়ের সর্বাঙ্গ যেন লেহন করছিল। বন্ধুকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হল না তার। চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোর বল তো! চেহারা এমন ভেঙে গেল কেন? লিভার?

অজয় হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল, না, না, লিভার আমার ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতই চলছে। একটু ক্লান্ত লাগে, এই পর্যন্ত। হয়তো খাটাখাটুনিটা বেশি হচ্ছে বলেই—

বাধা দিয়ে সমর জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছিস তো? ওমর খৈয়ামের মত 'দাও পেয়ালা পূর্ণ করে' চালাচ্ছিস না?

না হে ডাক্তার, না। সে প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও নেই। যে জোয়াল বাবা কাঁধে চাপিয়েছেন—

আচ্ছা জামাটা খুলে ফেল তো। একবার পরীক্ষাটা করে নিই।

আপত্তির সুরে অজয় বললে, তোকে বলছি কিচ্ছু না। বরং একটা সর্বরোগহরজাতীয় টনিক দে, তাতেই—

সমর প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, কি করতে হবে, আমি জানি। তুই খোল্ জামা! অগত্যা অজয়কে সোফার ওপরেই শুয়ে পড়তে হল। সমর গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পরীক্ষা করে চলল তাকে। ফাঁকে ফাঁকে অজয় বর্ণনা করে গেল তার দুঃখের কাহিনী, জানিস, বাবা নিজেকে

হঠাৎই গুটিয়ে নিয়েছেন—সব কিছু ভার চাপিয়ে দিয়েছেন আমার কাঁধে। এখন ভদ্রলোক বারান্দায় বসে বসে চুরুট টানেন, আর আমি ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতন যখন বাড়ি ফিরি, তখন তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। ভাবটা এই, বোঝ বাছাধন কত ধানে কত চাল।

হাতের কাজ বন্ধ না রেখে সমর জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ফিরে কি করিস?

করি? করিটা কখন? ফিরতে ফিরতে তো কোনদিন রাত এগারোটা বারোটা, কোনদিন বা রাত কাবার।

বিস্ময়ভরে সমর একবার না তাকিয়ে পারল না।

হা হা করে হেসে উঠল অজয়। বলল, অবাক হচ্ছিস? ভাগ্য ভাল যে বিয়েটা করিনি! তাহলেই উদ্বাহ বন্ধনটা উদ্বন্ধনে দাঁড়াত রে! নিত্য বিরহের এই জ্বালা দুনিয়ার কোন সতী-সাধ্বীই বোধ হয় সইতেন না।

বন্ধুকে পাশ ফিরে শোবার ইঙ্গিত করে সমর নিরুত্তাপ গলাতেই প্রশ্ন করল, কিন্তু তুই'ই বা এত বাড়াবাড়ি করিস কেন?

অজয় অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সুর পাল্টে বলল, করি নিছক বাহাদুরি দেখাবার জন্যে নয় সমর। বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলার মধ্যে, চালানোর মধ্যে যেন একটা মোহ আছে। সুন্দরী মেয়ের তীব্র আকর্ষণও বলতে পারিস।

সমর ভ্রূকুঞ্চিত করল। পাশ ফিরে ছিল বলে অজয় সেটা লক্ষ্য করতে পারল না। নিজের খেয়ালেই বলে চলল, এই তো সবে মইয়ের প্রথম ধাপে পা দিয়েছি। অদূর ভবিষ্যতে মনে হয় একেবারে শেষ ধাপে উঠে যেতে পারব। ভদ্রলোককে তখন দেখাব মুচকি হাসতে আমিও পারি।

সমর পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, শেষেরও তো শেষ থাকে শুনেছি।

হ্যাঁ, সেটা প্রস্থান; তবে মহাপ্রস্থান কিনা ঠিক বলতে পারব না।

হাত ধুতে সমর বাথরুমে গিয়ে ঢুকতেই অজয় উঠে বসে তার ছেড়ে

রাখা জামাটা গায়ে গলিয়ে নিল। সমর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসতেই সে হাল্কা স্বরে প্রশ্ন করল, শরীরযন্ত্রের কোথাও কি বৈকল্য ঘটেছে বন্ধু?

সমর তার পেশাসুলভ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, এখনও নয়। তবে সারারাত ধরে কাজের মোহ তোকে ছাড়তে হবে। মানুষের স্নায়ুরও তো সহ্য করবার একটা সীমা আছে। মাথা থেকে বর্তমানে তোকে রাজমুকুটটি খুলে ফেলতে হবে। দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তাগুলো দূরে ঠেলে, খেলাধুলো আর খুশিমত ঘুরে বেড়ানো—এইতেই কিছুদিন মেতে থাকতে হবে।

বিষণ্ণ হাসি হাসল অজয়। বলল, ডানা দুটো ছেঁটে দেওয়া হয়েছে রে, কাজেই ওসব আর পারব না। তুই বরং একটা টনিক ফনিক কিছু দে।

তাই দোব। এক বোতল চল্‌তি-হাওয়ার-পন্থী নরনারীর সাহচর্য। উচ্ছল প্রাণের ধারায় ছুটে চলেছে, এমন একদল তরুণ-তরুণী। আয়!

বন্ধুর মুখে এমন কাব্যিক কথাবার্তা শোনবার আশা অজয় কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। কতক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে বলল, তুই কি কোথাও নিয়ে যেতে চাস?

সমর উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, স্বাস্থ্যনিবাসে। উঠে পড়, আর দেরি করিসনি।

তার ভাবভঙ্গি দেখে অজয় বেশ খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ল বন্ধুর সঙ্গে।

লীলার সঙ্গে আলাপ সেই দিন থেকে।

প্রথম পরিচয়েই বিচিত্র এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দুজনের মনেই। অজয়ের মনে হল জীবন-নদীতে অতি অকস্মাৎ একটা নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার দেখা দিয়েছে। আর লীলার বুকের ভেতর রক্তস্রোতটা উত্তাল হয়ে উঠে শ্বাসরোধ করে আনল তার। কেমন যেন থিতিয়ে গেল সে।

গভীর রাত্রে দত্তবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে সমর যখন নিজের চেম্বারে ফিরে এল, তখন তার মনে প্রচ্ছন্ন একটা অস্বস্তি। মাথার ভেতর

এলোমেলো চিন্তা। নিত্যকার মত আন্তরিক আপ্যায়ন সে পায়নি। সে অবহেলিত, সে অনাদৃত।

সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতি রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

পরদিন থেকে সমর কাজের চাপে নিশ্বাস নেবার ফুরসতটুকুও পেল না। নতুন নতুন রোগীর আনাগোনা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল শক্ত শক্ত গোটাকয়েক অস্ত্রোপচার।

হপ্তাখানেক পরে কাজের চাপ যখন একটু হালকা হল, তখন প্রথমেই তার মনে হল অজয় আর লীলার কথা। এতদিনের ভেতর কেউ তো আসেইনি, বা তার খবরটুকুও নেয়নি। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সে প্রথমেই অজয়কে ডাকল; কিন্তু শুনল সে বেরিয়ে গেছে।

এরপর সে লীলাকে ফোনে ডাকল। অনুরোধের সুরে বলল, হপ্তাখানেক পরে আজ একটু ছুটি মিলেছে। কোথাও ঘুরে আসবে?

লীলা কিছুটা নিরুত্তাপ গলাতেই জবাব দিল, না, আজ বেরোতে পারব না।

মনঃক্ষুণ্ণ কিছুটা হলেও সমর সহজ কণ্ঠেই বলল, বেশ, তাহলে আমিই একটু পরে যাচ্ছি।

ঠিক সন্ধ্যার মুখেই সমর দত্তবাড়ি গিয়ে হাজির হল এবং প্রথমে যে লোকটির ওপর তার দৃষ্টি পড়ল সে হচ্ছে অজয়। বাড়িতে আর কোন অতিথি ছিল না; সুতরাং—

ব্যথা পেল সমর। বুকের ভেতরটা মনে হল কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে টানছে। তবু মুখের হাসি তাকে বজায় রাখতে হল। অজয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে আনন্দ প্রকাশও করতে হল।

বন্ধুর সঙ্গে লীলার সম্বন্ধটা জানত না বলেই অজয় সত্যকার খুশিতে একেবারে উপচে উঠল। তার পিঠে গোটাকয়েক চাপড় কষিয়ে বলল, এর সব কৃতিত্বই তোর। বিনা ওষুধে এমন প্রেসক্রিপশন করতে আর কোন ডাক্তারই বোধহয় পারতেন না।

সমর ম্লানভাবে একটু হেসে একধারে বসে পড়ল। চোখ দুটো তার

ঘুরে বেড়াতে লাগল লীলার চলাফেরার সঙ্গে। তার হাসি, কথা বলার ভঙ্গি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বদলে গেছে, তার সম্বন্ধে লীলা অনেকখানি বদলে গেছে। যতবারই তার চোখে চোখ পড়ল, লীলা ফিরিয়ে নিল মুখখানা! দৃষ্টি তার অপরাধ কুণ্ঠিত। অথচ অজয়ের ওপর চোখ পড়তেই তার চোখে বিচিত্র এক আলো ঝলসে উঠছিল। মুখে নেমে আসছিল অপরূপ কমনীয়তা। বিমুগ্ধা কুরঙ্গিণীর ভঙ্গি তার কথা বলায়, হাসিতে।

বিক্ষুব্ধ মন নিয়েই সমর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের ক্লিনিকে। অকারণ রূঢ় হয়ে উঠল মায়ার ওপর। পরক্ষণে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, এক-রকম জোর করেই তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিল।

অবশ্য প্রতিবাদ করেনি মায়া। শুধু নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সারারাত চোখের জল ফেলল।

এর পরও বহুবারই সমর দত্তবাড়িতে গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেন বাঁচবার দুস্তর চেষ্টায় হাত-পা ছুঁড়ছে। তাতে জলেই ঢেউ উঠেছে, আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, বাঁচবার মত মাটি মেলেনি পা রাখার।

প্রতিবারই তার দেখা হয়েছে অজয়ের সঙ্গে।

সেদিন রাত এগারোটা বেজে যেতে সমর রোগীদের হাত থেকে বিশ্রামের অবসর পেল। ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিল আরাম কেদারাটার ওপর। চুরুট একটা ধরাল বটে, কিন্তু টানতে পারল না। কি এক গভীর অস্বস্তি যেন রক্তকোষের ভেতরে ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। রগের শিরাদুটো দপদপ করছে। চোখ দুটোয় আগুনের হল্‌কা।

মায়া তার হোস্টেলে ফিরতে গিয়েও পারল না। থেকে থেকেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে উঁকি দেয়।

বিরক্ত হল সমর। পুরুষকণ্ঠে বলল, কাজ হয়ে গেলেই আপনাকে তো কত দিন বাড়ি চলে যেতে বলেছি মিস দে।

মায়ার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল। কি একটা বলতে গিয়েও

পারল না।

বোধ করি অকারণেই রূঢ় হয়ে উঠল সমর, আপনার এই বাড়াবাড়িতে আমার সুনামটা যে নষ্ট হতে পারে, সেটা ভাবেন না কেন ?

মায়া চমকে উঠল। মনে হল কে যেন তার পিঠে কশাঘাত করেছে। চোখের জল চাপতে চাপতে ছুটেই সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই অজয় এসে হাজির হল। সেদিন লীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আজই প্রথম এল।

সমর বেশ খানিকটা অবাকই হল। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই রাত দুপুরে ? দত্তবাড়ি থেকে নাকি ?

অজয় সংক্ষেপে জবাব দিল, হ্যাঁ। তারপরই নিজের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসে পড়ল।

সমর চুরুটের বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল অজয়। কোন কিছুতেই যেন তার উৎসাহ নেই। এক সময় সোজাসুজি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, লীলাকে তুই ভালবাসিস, সমর ?

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কাটল। তারপর এক সময় নিরস কণ্ঠে সমর জবাব দিল, হ্যাঁ বাসি। তাতে আপত্তির কোন কারণ আছে ?

অজয় একটা চুরুট বেছে নিয়ে ধরাচ্ছিল ; অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আমরা দুই যুযুধান শত্রু নই সমর। বন্ধুর মতই আলোচনা করতে চাই। কারণ আমিও তাকে ভালবেসেছি।

আমায় কি করতে বলিস ? সরে দাঁড়াই ?

না। তবে বন্ধু হিসেবে আমার কর্তব্য, কথাটা তোকে খুলে বলা।

ধন্যবাদ। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল কি ?

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। অজয় একসময় ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, এমন একটা জিনিস যে আমাদের মধ্যে ঘটবে, কোনদিন কল্পনাও করিনি। তোর কিন্তু আগে থাকতেই আমাকে একটু আভাস দেওয়া উচিত ছিল

সমর।

সমর মুখ তুলে তাকাল। ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, কেন? এ তো কারও ইজারা করা সম্পত্তি নয়। লীলাকে ভালবাসবার অধিকার আর সবায়ের মতন তোরও আছে।

মুখে সে একথা বললেও তার মন বলল, এটা বিশ্বাসঘাতকতা।

অজয় ক্লান্ত সুরে বলল, এখন ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তবে জেনে রাখ, বরমাল্য যার গলাতেই দুলুক আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ক্ষতিবৃদ্ধি বলতে কিসের ইঙ্গিত করছিস?

আমাদের বন্ধুত্বের।

সমর তিক্ত হাসি হেসে উঠল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, কথাটা অতিনাটকীয় হয়ে যাচ্ছে না?

না। অজয় আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, আমি চাই তুইই আগে লীলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কর। কারণ দাবিটা তোরই প্রথম।

সমরের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ইস্পাত কঠিনতা। শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, তাতে লাভ হবে কিছু? বেশ, তুই যখন বলছিস, তখন আমিই যাব। গিয়ে প্রস্তাব করব তার কাছে।

ভগবান তোর মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

অপরিচিত দুই ব্যক্তির মত সেদিন রাত্রে দুই বন্ধু পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

পরদিন সত্যিই সমর দত্তবাড়ি গিয়ে হাজির হল। তার ভাগ্য ভাল, তাই লীলাকে একাই পেল। সমস্ত রকম ভূমিকা পরিহার করে সে সোজাসুজি প্রস্তাব করল লীলার কাছে।

লীলা প্রথমটা অবাক হল। তারপরই তার মুখে দেখা দিল ক্রোধের রক্তিমা। রূঢ়কণ্ঠেই সে বলল, তুমি আমাকে পেয়েছ কি? তোমার ক্লিনিকের নার্স, না বাড়ির দাসীবাঁদী?

সমর ভ্রূক্ষেপই করল না তার বিরূপ মন্তব্যে। বক্তব্যটা আবার বলল, বিয়ে করতে আমায় রাজি আছ লীলা? তুমি তো জানো, আমি

তোমায় ভালবাসি।

তুমি অভদ্র, বর্বর। তোমাকে কোনদিনই বিয়ে করতে পারব না আমি।

ওটা ছাড়া, অন্য কোন কারণ আছে?

লীলা বিদ্রূপের সুরে বলল, শুনলে যদি খুশি হও তাহলে বলতে আমার বাধা নেই। তোমার চেয়ে যোগ্য পাত্র আমি পেয়েছি। কথাটা বলে ফেলেই সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। এতখানি রূঢ় না হলেও সে পারত।

সমর কিন্তু স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, যোগ্যতর পাত্রটি কি অজয়?

হ্যাঁ। অস্ফুট কণ্ঠে লীলা জবাব দিল।

সমরের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। চোখে দেখা দিল শাণিত দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সত্যভাষণের জন্যে ধন্যবাদ। তবে অসভ্য বর্বর বলে পরিহাসটা না করলেই পারতে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অতএব অজয় আর লীলার বিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল। নির্দিষ্ট তারিখের আগের রাত্রে অজয় এল সমরের ক্লিনিকে। চেম্বারে পা দিয়েই সে রাগতকণ্ঠে বলে উঠল, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস সমর। তোর সামনে লীলা যা-ই বলে থাকুক, আসলে সে—

বাধা দিল সমর, আমি কৈফিয়ৎ চাইনি অজয়—

তুই না চাইলেও, আমাকে তো—

রক্ষে কর ভাই, আমার অনেক কাজ।

হতাশ হয়ে পড়ল অজয়। অভিমানাহত কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। একদিন না একদিন সব বুঝবি তুই। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চিরকাল থাকতে পারে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। তাছাড়া শুধু এইটুকু বলতেই আমি তোর কাছে আসিনি।

সমর স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে—এই তো ?

হ্যাঁ, যাওয়া চাইই।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সমর। চোখে তার এক বিচিত্র আলো ঝলসে উঠল। হেসে বলল, ঠিক আছে, যাব আমি। বিদায়টা জমবে ভাল।

বিবাহ চুকে যাবার পর অজয় আর লীলা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কলকাতার বাইরে চলে গেল।

এসব তথ্য কাগজের পাতা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করল মায়া। লোভীর মতই মনে মনে রোমন্থন করত সেগুলো। বিজাতীয় এক আনন্দ পেত যেন।

সেদিনও এমনি এক সংবাদের ওপর বসে বসে চোখ বুলাচ্ছিল, এই সময় ডাক এল সমরের ঘর থেকে।

দু-হাতে মুখ চেপে বসেছিল সমর। মায়া কাছে এসে দাঁড়াতেই ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এখনও ক'জন রুগী ক্লিনিকে আছেন মিস দে ?

আর একজন।

তাঁকে কোনরকমে বিদায় করতে পারেন ?

রীতিমত বিস্মিত হল মায়া। তবে সেটা যথাসাধ্য গোপন করে জবাব দিল, তা হয়তো পারি। বাড়ি যাবার জন্যে তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন—

খাসা। তাহলে তাঁকে জেলখানা থেকে খালাস করে দিন। তিনিও হাসতে হাসতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

কিন্তু—কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না !

সমর নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল, দিন কয়েকের জন্যে ক্লিনিক বন্ধ রেখে একটু বেড়িয়ে আসব ভাবছি।

মায়া চমকে উঠল। অব্যক্ত কণ্ঠে বলল, বেড়িয়ে আসবেন ? কোথায় ? কতদিনের জন্যে ?

কে বলতে পারে? হয়তো বিশ তিরিশ বছরের জন্যে। অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকি।

মায়া শিথিল দেহে বসে পড়ল অনতিদূরে।

সেটা লক্ষ্য করে সমর ম্লানভাবে হাসল। বলল, আপনার সাময়িক একটু অসুবিধে হবে তা বুঝছি। অবশ্য আমি তিন মাসের মাইনে আপনাকে দিয়ে যাব।

ঢোক গিলল মায়া। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কবে যেতে চান?

কবে কি?—আজই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই।

মায়া আঁৎকে উঠল, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই! কিন্তু কোথায় যাবেন?

সে-প্রশ্নটা নিয়ে এখনও মাথা ঘামাইনি। আর তাতে লাভটাই বা কি? পকেট থেকে খানদুয়েক দশ টাকার নোট বার করে সমর টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। বলল, এতে যদ্দূর যাওয়া চলে।

মায়া বিস্ফারিত নয়নে শুধু তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ যেন একটা কিছু মনে পড়েছে, এমনই ভঙ্গিতে সমর জিজ্ঞেস করল, আমাদের টাইম টেবল্ আছে না? দয়া করে যদি একবার এনে দেন।

মায়া নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল একখানা 'ব্র্যাড্শ' হাতে।

মায়া ভারী বইখানা তার সামনে ধরে দিতে যেতেই সমর তাকে ইঙ্গিত করল খুলে দেখতে। বলল, শুধু দেখবেন কুড়ি টাকার মধ্যেই যেন ভাড়াটা হয়। আর—আর কোন অখ্যাত অজ্ঞাত স্টেশন হলে তো কথাই নেই—সোনায় সোহাগা—

মায়া পাতার পর পাতা উল্টে চলল। একসময় মুখ তুলে বলল, একটা পেয়েছি, মনে হচ্ছে—গিরমহল···ভাড়া উনিশ টাকা সত্তর পয়সা···

খাসা। সমর রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠল, গিরমহল···নামটা কখনো শুনিনি। আপনি শুনেছেন নাকি?

না।

রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছে। অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত জায়গা।

সে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে কতকটা আত্মগতভাবেই বলে চলল, হয়তো সেখানে বড়জোর দশবিশটা কুঁড়ে ঘর···পোস্ট অফিস থাকতেও পারে, না-ও পারে···হপ্তায় একদিন হাট ···মাইল দু'তিন দূরে হলেই বা ক্ষতি কি?···খালি পায়ে শক্ত সমর্থ গ্রামের মেয়েরা শাকসব্জী মাথায় নিয়ে বেচতে আসে। তাদেরই এক-জনকে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করব···সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরে উঠবে··· তারা ভালবাসবে আমায়, শ্রদ্ধা করবে আমায়···তা যদি না করে ঠেঙিয়ে পাট করব সবাইকে—

হঠাৎ মায়ার ওপর দৃষ্টিটা পড়তেই সে থেমে গেল। সঙ্কোচের হাসি হেসে বলল, আমার ভাবী জীবনের ছবি আঁকিনি, মিস দে; লেখক হবার উপক্রমণিকা। আমি একটু বেরোচ্ছি। বাড়িওলার সঙ্গে রাফসাফ করে আসি। বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। আপনি ইত্যবসরে ছুটো ব্যাগে আমার জিনিসপত্রগুলো ভরে রাখুন দয়া করে। শল্য-চিকিৎসার হাতিয়ারগুলো দিতে ভুলবেন না।

কথাশেষে ঝড়ের মতই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মায়ার মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না।

সত্যিই ঘণ্টাখানেক বাদে সমর ফিরে এল এবং ভেতরে পা দিয়েই একেবারে আঁৎকে উঠল। সারা মেঝে জুড়ে অসংখ্য ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল, ব্যাগ ইত্যাদি ছড়ানো; আর ভারি একটা সুটকেশের ওপর মায়া পা ছড়িয়ে বসে। মুখ তার তেমনি ভাবলেশহীন।

এসব কি?

মায়া উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, আমিও যাচ্ছি তো।

যাচ্ছেন? কোথায়?

গিরমহলে।

মুহূর্তের জন্যে সমর হতবাক হয়ে গেল। কথাটা সে বিশ্বাসই করতে

পারছিল না। পরক্ষণে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, কি বলছেন পাগলের মত ? যেখানে যাব, আপনাকে ছায়ার মতই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে নাকি ?

একা থাকার বিভীষিকা বোধ করি মায়ার মন থেকে সব সঙ্কোচ, শঙ্কা দূর করে দিয়েছিল। মৃদু অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠেই সে বলল, আমি যাবই !

না। আমি একা যেতে চাই।

আপনি একাই থাকবেন। আমি কোন সময়ে কোন কারণে আপনার সামনে এসে বিরক্ত করব না !

কেন বুঝছেন না ? আমি কোথা থেকে আপনাকে মাইনে দেব ?

মাইনে তো আমি চাইছি না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই রওনা হতে হয়। সমর মরীয়া হয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কেন বুঝছেন না মিস দে, আমি কোথায় থাকব, কি করব জানি না। অপরিচিত জায়গা—চোর-ডাকাত, বাঘ-ভাল্লুক থাকাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া···তাছাড়া আমি যে যুধিষ্ঠির সেজেই থাকব—

মায়ার চোখে ততক্ষণে জল ঘনিয়ে এসেছে। বাধা দিয়ে সে বলল, কেন মিথ্যে আমায় বারণ করছেন ? আমি যাবই। আমি বোকা-সোকা মেয়ে, কার ভরসায় এখানে একলা থাকব। সবাই advantage নেবে !

চেষ্টা যে মিথ্যা সেটা মর্মে মর্মে বুঝল সমর। হতাশার ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে। মেয়েরা জেদ ধরলে কে কবে তাদের নিরস্ত করতে পেরেছে ?

মায়া খুশি হয়ে উঠল। চট্ করে চোখের জল মুছে বলল, আর আধঘণ্টা মাত্তর সময়। আমি ফোনে দুখানা ট্যাক্সি বলে দিয়েছি। খাওয়ার কোন হাঙ্গামা করে কাজ নেই। ট্রেনেই ডাইনিং-কার আছে। আর ভোরের দিকে তো আমরা পৌঁছেই যাচ্ছি।

সুনিপুণ ব্যবস্থা ! সমর হাসবে না কাঁদবে, ভেবে না পেয়ে ভারি ভারি ব্যাগ দুটো তুলে নিল। মনে মনে বলল—তুমি বোকা-সোকা

মেয়ে। হুঁ।

ভোরের দিকে ট্রেন গিরমহলে গিয়ে থামল।

পাহাড়ের সানুদেশে ছোট্ট স্টেশন। কুলির বালাই নেই। না বা আছে যাত্রীর। শুধু একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ়কে পোস্টাল ভ্যান থেকে গোটা দুয়েক ব্যাগ নামাতে দেখা গেল। কে জানে, লোকটি হয়তো একাধারে পিয়ন এবং পোস্টমাস্টার দুই-ই।

বড় জোর মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ট্রেনখানা আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। শূন্য প্ল্যাটফর্মে মালপত্রের মাঝখানে বসে রইল সমর আর মায়া।

লোকালয় বলতে স্টেশনের কয়েকশ' গজ পেছনে গোটাকয়েক কুটিরকে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সেখান থেকে আধমাইল-টাক দূরে ত্রিভুজাকৃতি একটা পাহাড়ের চুড়োয় যে বড় বাড়িখানা রোদের মুকুট মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম দর্শনে সেটাকে দুর্গ বলেই মনে হয়।

ব্যাগ হতে পোস্টমাস্টারকে এদিকেই আসতে দেখে সমর উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করে সে জিজ্ঞেস করল, এখানে কোন কুলি পাওয়া যাবে না?

কুলি! ভদ্রলোক হাহা করে হেসে উঠলেন। চোখ মিটমিট করতে করতে বললেন, কুলি বলতে আমিই।

আপনি কি এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, না থেকে আর যাব কোথায়? অধীনের নাম পাণ্ডে—রামস্বরূপ পাণ্ডে। পোস্টমাস্টার অ্যাণ্ড মার্চেন্ট। ছোটখাটো একটা বিশ্বকর্মা ভাণ্ডার আছে।

ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলেন। তা বলুন, সমরের তাতে সুবিধাই হল। সাগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল, আমরা এখানে কিছুদিন থাকব ভাবছি। সুবিধেমত কোন বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে কি?

এমন একটা বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে কেউ কোনদিন আসেনি। চোখ

দুটো যতটা সম্ভব বিস্ফারিত করে তিনি জবাব দিলেন, অজ্ঞাতবাসে এসেছেন ? তা কতদিনের জন্যে ?

সমর একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠল, চিরকাল। যতদিন না মৃত্যু তার হিমশীতল বাহুবন্ধনে বেঁধে নিয়ে যায়।

কতক্ষণ নির্বোধের মতই পাণ্ডে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বারকয়েক ঢোক গিললেন, তারপর মায়াকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়ের গৃহিণী ?

মায়ার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল ; সমর কিন্তু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল, না, আমার সেবিকা, মানে নার্স। আমি ডাক্তার।

পাণ্ডের চোখ দুটোয় একটা আলো চকচক করে উঠল।

আচ্ছা, আপনাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন ?

জী হাঁ ! সাতমাইল দূরের এক গাঁয়ে। কালব্যাধি ধরলে তাঁকে ডাকতেই হয়।

হাসি চেপে সমর বলে, কালব্যাধি যদি ধরে, তখন আর ডাকা-না-ডাকা তো সমানই।

মায়া ইত্যবসরে একটা স্যুটকেশের ওপর বসে পড়েছিল শিথিল দেহে। নেই, এ পোড়া দেশে আশা করার মত কিছুই নেই। তার অবস্থা দেখে সমর হেসে উঠল। পাণ্ডেকে বলল, দেখেছেন তো, সাধে আর বলে 'পথি নারী বিবর্জিতা' ! ওই বাড়িটার তাহলে কি হবে ? পাওয়া যাবে ?

পাণ্ডে মাথা চুলকোলেন, বহুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন, তারপর জবাব দিলেন, গিরমহলের কথা বলছেন ? ওই পাহাড়ের চুড়োয় যেটা ? আজ্ঞে এক বুড়ো সরকার ছাড়া আর তো কেউ ওখানে থাকে না।

ভাড়া পাওয়া যাবে না বোধ হয় ?

জানি না স্যার। কোনদিন তো কাউকে এসে থাকতে দেখিনি ! আর এসে কে-ই বা থাকবে বলুন ? আশপাশে গাঁও নেই, তা ছাড়া বাড়িতে যাবার ওই পাথুরে পাকদণ্ডী পথ !

এবার সমর যেন সত্যিই খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ল। এখানে এসেছে এক অন্ধ আবেগে, যুক্তি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যা করা চলে না। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি হার মেনে ফিরে যেতে হবে? একরকম মরীয়া হয়েই জিজ্ঞেস করল সে, আর কোন বাড়ি···যেখানে আমরা গিয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজতে পারি?

পাণ্ডেও চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। কতক্ষণ গুম হয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন, কই, সে-রকম তো কিছু···দাঁড়ান, দাঁড়ান হপ্তা দুই আগে বুড়ো মিশির মারা গেছে···তার বাড়িটা হয়তো খালি হলেও হতে পারে।

চমকে উঠল মায়া। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিসে মারা গেছেন ভদ্রলোক?

বয়েসের মৃত্যু মা! একশো তিন বছর সাত মাস যার উমার হল, তার কি কোন বেমারীর দরকার হয় মা?

সমর হেসে ফেলে বলল, সর্বনাশ! এই আজব দেশে লোকের গড়পড়তা পরমায়ু যদি একশো বছর হয়, তাহলেই তো আমায় ডেরা-ডেণ্ডা তুলে পালাতে হবে! পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, দয়া করে একটু খবর নেবেন, আপনার মিশির ঠাকুরের বাড়িটা পাওয়া যাবে কি না?

তা হয়তো যাবে স্যার। তবে এক বাত বলছি কি, আমার মত আপনাদের দুজনেরও দেখছি বহুত ভুখ লেগেছে! দয়া করে আমার গরীবখানায় চলুন। কিছু খানাপিনা করে নিন দুজনে।

অতি উত্তম প্রস্তাব! মিস দে-র কোন আপত্তি নেই তো?

মায়া উঠে দাঁড়াল। কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে জানাল, তার কোন আপত্তি নেই।

খুশি হলেন পাণ্ডে। একগাল হেসে বললেন, আমাদের সামান সব এখানেই পড়ে থাক। কিছু ভাবনা করবেন না। গিরমহলে চোর-ডাকু নেই। পরে ছোকরাদের পাঠিয়ে দেব নিয়ে যেতে।

অতঃপর সমর আর মায়া মৃত মিশিরের বাড়িতেই অধিষ্ঠিত হল। যেটা তারা আশঙ্কা করেছিল, বাড়িখানা তার চেয়ে কিন্তু অনেক ভাল।

চারখানা মাঝারি আকারের ঘর, আলো-হাওয়া প্রচুর ; চারদিকে কামিনী গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

মায়া ব্যবস্থার ভারটা নিজের হাতেই তুলে নিল। সামনে বড় ঘরখানা ডাক্তারের রোগী দেখার। ছুপাশেই ছুখানা ছোট ঘর—ছুজনের শোবার। আর পেছনের খানা যৌথ খাবার এবং বসবার ঘর। সুবিধের মধ্যে ছুপাশের শোবার ঘর থেকেই মাঝখানের ছুখানা ঘরে যাতায়াত করা যায়।

সমর তাকিয়ে মায়ার গৃহকর্ম দেখছিল। একসময় গভীর স্বরে বলল, মিস দে, যদি কিছু মনে না করেন, একটা ব্যবসাদারী কথা বলি। বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়ার খরচ সব আমার। কিন্তু নিজের জীবিকা আপনাকে নিজেই অর্জন করতে হবে। সেটা রান্নাবান্না এবং পরিবেশন করে। রোজগারের বেলায় কোন প্রতিযোগিতা চলবে না কিন্তু। কোন প্রসব করানোর কেস এলে আপনি আপনার পারিশ্রমিক পাবেন, অন্য রোগের বেলায় কিন্তু ভিজিট যা কিছু—তা চাল-কলাই হোক, আর নগদ দক্ষিণাই হোক, আমার নিজস্ব। রাজী ?

হাতের ঝাঁটাটা আবার তুলে নিয়ে রেখাহীন মুখে মায়া জবাব দিল, রাজী, ডাক্তার রায়।

কে জানত নাম লেখা বোর্ডখানা বাড়ির সামনে টাঙানো রীতিমত একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হবে! গিরমহল থেকে তো বটেই, আশপাশের আরো পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে সমস্ত লোক ঝেঁটিয়ে এল দেখতে। পোস্টমাস্টার পাণ্ডে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজস্ব ভাষায় এক দার্ঘ বক্তৃতা দিলেন : ভাইলোগ! আর মরবার ভয় নেই। সবকোই এখন থেকে মিশির ঠাকুরের মত একশো বরস জিন্দা থাকবে। কৈঁউ কি কোলকাত্তা থেকে ভারি ডাংদার সাব আমাদের মধ্যে আসিয়ে গেলেন। যো কুছ বেমারী হবে, ডাংদার সাবকে দেখলেই ভাগবে···

ঘন ঘন হাততালি পড়তেও ত্রুটি হল না।

দিন কেটে চলল। ডাক প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ভাগ্যবলে জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা। শূন্য ঘরে বসে সমর মনে মনে হিসেব করে, এই হারে চললে, পুঁজি যা সঙ্গে এনেছে, তাতে পুরো বছর চলে যাবে। তার ওপর গাঁয়ের লোকের স্নেহের দান তো আছেই। সে-দান মহার্ঘ কিছু নয়, শাকসব্জী, কিছু ফল বা ডিম। প্রথম প্রথম সমর দাম দিতে চেয়েছিল, তাতে মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছিল তারা। ডাক্তারবাবুদের তারা মনে করে এ-গাঁয়ের মান্য অতিথি। অতিথি সংকারের কতটুকু কি-ই বা তারা করতে পেরেছে!

কৃতজ্ঞতায় সমরের মন ভরে ওঠে। ভরা মন আবার উপচে পড়তে চায় যখন সে বোঝে তার বেকারত্ব ঘুচোতে লোকগুলো মিথ্যে রোগের ছলনায় নিজেদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের তার সামনে এনে হাজির করে। গিরমহল থেকে চার মাইল দূরে প্রতি সোমবার যে হাট বসে, সেখানে তারা তাদের ডাংদার সাবের এমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রচারকার্য চালায়, যার দু-চারটে কথা কানে এলেও লজ্জায় সমরকে ছুটে পালাতে হত।

মায়া কিন্তু এখানে এসে সত্যিকার সুখী হয়েছে। সমরের কাছে যেটুকু সঙ্কোচ তার ছিল, ধীরে ধীরে তা যেন কেটে যাচ্ছিল। এখন সে তার সামনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসে, সময় বিশেষে পরিহাস করতেও ছাড়ে না। নতুন বান্ধবী জুটিয়েছে সে পাণ্ডের স্ত্রীকে। প্রায়ই তার বাড়িতে যায়, গল্প-গুজব করে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

সমর কিছু দেখে, কিছু বা শোনে। মনে মনে মায়াকে ঈর্ষাও হয়তো করে। তবু সে তার মত সহজ স্বাভাবিক কোন রকমেই হয়ে উঠতে পারে না। অধিকাংশ সময় আত্মমগ্ন হয়েই থাকে সে। বেড়াতে বেরোয়ও একা। মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথে যখন হাঁটে, তার মুখ দেখে মনে হয়, বিষণ্ণতার শিকারী পাখিটা প্রশস্ত দুই ডানা মেলে তার অন্তরের আকাশ ঢেকে রেখেছে। মায়ার সঙ্গে কোথাও তার কোন বিরোধ নেই, তবু ঘনিষ্ঠও সে হতে পারেনি। অবশ্য সে চেষ্টাও করেনি।

কেন, সে-জবাব হয়তো সে নিজেও দিতে পারত না। প্রথম দিকে অস্বস্তি ছিল, তাদের দুজনকে এক বাড়িতে থাকতে দেখে গাঁয়ের লোক হয়তো অনেক কিছু ভেবে নিতে পারে। কিন্তু না, সাদাসিধে লোকগুলো মিথ্যা কুৎসা রটানোর অনেক উর্ধ্বে! তবু···

পেছন দিকের খাবার ঘর থেকে পাহাড়ের চূড়োয় গিরমহল বাড়িখানা বেশ পরিষ্কারই দেখা যায়। হাতে কাজ না থাকলে সমর অনেক সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে বাড়িখানাকে মনে হয় যেন অতিকায় দৈত্য। অভ্রংলেহি তার লিপ্সা। ক্বচিৎ কখনো সে অন্ধকার স্তূপে আলোক-বিন্দু ফুটে ওঠে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। হয়তো বাড়ির তদারককারী সরকার আলো হাতে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সমরের বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

পাশে থাকলে মায়া আঁৎকে উঠে বলে, বাড়িটার দিকে চোখ পড়লেই আমার গা ছমছম করে। কত যুগের কত রহস্য যেন জমা আছে ওখানে। কে জানে, হয়তো বীভৎস ইতিহাসও একটা আছে!

সমরের নিজেরও সেটা মনে হয়। তবু মায়াকে আরো খানিকটা ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে গড়গড় করে বলে যায় গিরমহলের এক কাল্পনিক ইতিহাস। বলে, একবার সে একা ওই বাড়িখানায় ওঠবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাকদণ্ডী পথ বেয়ে ওঠবার মুখে কে যেন বার বার তাকে নির্মমভাবে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। দয়া করে প্রাণে যে মারেনি, এইটুকুই ভাগ্য।

দীর্ঘ ন' মাস এইভাবে কেটে গেল। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে না দেখা দিল কোন অশান্তির আবর্ত, না বা প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ। উত্তরমুখী ভাগীরথীর মত একটানা শুধু বয়ে গেছে।

অজয় আর লীলার বিবাহিত জীবনে কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অনেক ভাঙাগড়া, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে জীবনের স্রোত। প্রথম ছ'টা মাস তারা দুজনে পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। বাইরের জগতের দিকে তাকাবার অবসর ছিল না, প্রবৃত্তিও বুঝি ছিল না। তারপর

একদিন তারা সচেতন হয়ে উঠল। মেনে নিল, না, বাইরের জগতের দিকে চিরদিন পেছন ফিরে থাকা চলে না। দাম্পত্য জীবনের প্রবল আসক্তি তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রাখর্য কমেছে, স্থির হয়ে গেছে প্রদীপের মৃদু অকম্পিত শিখার মতই। নতুন করেই অজয় কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে লীলা এতটুকু অসুবিধে বোধ করেনি। ঘর-সংসারের হাজারো কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে, আস্বাদন করেছে স্বামী-প্রেমের মধুরতাটুকু। শুধু সমরের কথাটা মনে হলেই একটা বিঁধে থাকা কাঁটা বুকের কোথায় যেন খচখচ করে ওঠে। বিবেক তার কুণ্ঠিত ছিল বলেই পারতপক্ষে সে সমরের নাম উল্লেখ করত না। শুধু একটি দিনই কথায় কথায় অজয়কে বলেছিল, তোমার বন্ধু সমরবাবুটির বিচিত্র ব্যবহারের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। কেন যে সেদিন অমন অভদ্রের মতন ব্যবহার করেছিলেন!

অজয় একটুখানি চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, হয়তো বেচারা বড় বেশি ভালবেসেছিল তোমায়, তাই সহজ মনে পরাজয়টা সে মেনে নিতে পারেনি।

প্রতিবাদের সুরে লীলা বলে উঠল, না, আমার তা মনে হয় না। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে!

আর কি কারণই বা থাকতে পারে?

তা আমি জানি না। তবে···

তবে ওর সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করাই ভাল লীলা।

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যার পর লীলা সত্যিই স্বামীর সামনে সমরের নাম আর কোনদিন উল্লেখ করেনি।

পরিশ্রমটা বড় বেশি করছিল বলেই ভেতরে অজয়ের স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়ছিল। প্রথম দিকে লীলা সেটা লক্ষ্য করেনি। করল যেদিন, সেদিনই শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, এরকম ভাবে অবহেলা করাটা তো ঠিক নয়। একজন ডাক্তার দেখাও।

অকারণে অজয় যেন আহত জন্তুর মতই গর্জন করে উঠল, ডাক্তার! শহরে কোন ডাক্তার নেই। ছিল একজনই—সে চলে গেছে।

কোথায় তা ভগবানই জানেন।

লীলা আর কোন প্রতিবাদ করেনি। তাই বলে নিরস্তও হতে পারেনি। মরীয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত সে শ্বশুরের শরণাপন্ন হল।

ব্যবসাটা পুরোপুরি ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ মিঃ সেন অবসর নিয়েছিলেন। জীবনে তাঁর শুধু একটিই আনন্দ ছিল। কাগজের পাতায় দূর গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন হাতড়ে বেড়ানো। সেদিনও বসে তাই করছিলেন। পাশেই চায়ের খালি পেয়ালা, সামনে টেবিলের ওপর দৈনিক আর মাসিক-পত্রের স্তূপ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

লীলা ঘরে ঢুকে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে মৃদু কণ্ঠে বললে, বাবা, আপনার ছেলের শরীর নিয়ে তো রীতিমত ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল।

মুখ তুললেন মিঃ সেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কেন, কি হয়েছে মা?

লীলা তাঁর কাছে কিছুই গোপন করল না। ডাক্তার দেখানোয় অজয়ের আপত্তির কথাও জানাল।

মিঃ সেন সবটুকু শুনে গেলেন। পরে শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কিচ্ছু ভাবনা কর না লিলি! আমাকে শুধু একটু সময় দাও।

তা নয় দিচ্ছি। কিন্তু যা করবার, তাড়াতাড়ি করতে হবে বাবা। দেরি করলে হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে।

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সে, মিঃ সেন তাকে ফিরে ডাকলেন, শোন, শোন লিলি, এই ছবিখানা দেখ দিকিনি—

হাতের কাগজখানা পুত্রবধূর সামনে মেলে ধরলেন। পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত বাড়ির ফটো। তলায় লেখা: শীঘ্রই বিক্রয় হইবে।

শ্বশুরের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে লীলা ছবিখানা দেখে বলে উঠল, বাঃ! চমৎকার তো। ঠিক যেন স্বপনপুরীর রাজপ্রাসাদ।

কাগজখানা মুড়ে ফেলে মিঃ সেন গম্ভীর মুখে বললেন, ঠিক বলেছ মা, আমারও সেই মত।

দিন সাতেক পরে খাওয়ার টেবিলে মিঃ সেন ছেলেকে বললেন,

তোমার ব্যবসা চালাবার রীতিনীতি আমার পছন্দ হচ্ছে না বাবু !

অজয় বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তুমি সব গোলমাল পাকিয়ে ফেলছ ! ব্যবসা হবে ঋজু—সরল। বক্সিং তো কিছুদিন লড়েছ, নক-আউটটা বোঝ না ?

অজয় গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কি বলতে চাইছেন বাবা ?

কিছু না। কিছুদিন আমি আবার ব্যবসাপত্তর দেখব। যে জট পাকিয়েছ, সেটাকে আবার সোজা পথে চালাব।

যা খুশি আপনার ! বলে অজয় টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মিঃ সেন এবার পুত্রকে ছেড়ে পুত্রবধূকে ধরলেন, তোমার স্বাস্থ্যটাও তো খুব ভাল যাচ্ছে না লিলি ?

শ্বশুরের চাতুরীটা সে বুঝেছিল বলেই সেও মিথ্যার আশ্রয় নিল।

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, কি জানি বাবা, মাঝে মাঝে এমন কুঁড়েমি লাগে ! কিছুদিন ধরে রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না।

যেতে গিয়েও অজয় দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনে মনে সে লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। লীলার শরীর ভাল যাচ্ছে না, এটা সে আগে ধরতে পারেনি বলে। অভিযোগের সুরে সে স্ত্রীকে বলল, তুমি তো কই কোনদিন বলনি লীলা ?

লীলা হাসি চেপে বলল, ও এমন কিছু না। এমনি মাঝে মাঝে—

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠলেন, না, না, এসব উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। হ্যাঁ, তোমাকে যে বাড়ির ফটোখানা দেখিয়েছিলাম, মনে আছে লিলি ? সেই যে পাহাড়ের চুড়োর ওপর ?

হ্যাঁ, বাবা।

সেটা কিনে ফেলেছি মা। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, বেশ নির্জন। আমার ইচ্ছে, তোমরা সেখানেই কিছুদিন থেকে আসো। তদারকি করবার জন্য একজন সরকার রেখেছি। কোনরকম অসুবিধে হবে না।

লীলা নিরীহের ভঙ্গিতে বলে উঠল, আমার তো যাবার খুবই ইচ্ছে বাবা, কিন্তু—সে ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে।

অজয় ভারী গলায় বলল, ঠিক আছে।

তাই হবে বাবা। আমরা কিছুদিনের জন্যে বেড়িয়ে আসব।

মিঃ সেন পুত্রবধূর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু।

পাকদণ্ডী পথ বেয়ে গিরমহলে পৌঁছতে হলে নিশ্বাস ঘন হয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যায় বেড়ে। তবু চড়াই ভাঙতে ভাঙতে লীলা একেবারে আনন্দে উপচে পড়ল। তারই ছোঁয়া বুঝি লাগল অজয়কেও। সেও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তুজনেই এসেছে তারা। সঙ্গে কোন ঝি-চাকর আনেনি। সরকার ভজহরি ঠিক করে রেখেছে রোজ সকালে দেহাত থেকে একজন মেয়ে এসে তাদের বাসন মেজে রান্নাবান্না করে দিয়ে যাবে। এখানকার জীবনে বোধ করি তার বেশি কিছু প্রয়োজনও হবে না।

অনেকখানি উঁচুতে উঠে এসে লীলা ফেলে-আসা গ্রামখানার দিকে একবার ফিরে তাকাল। এখান থেকে সেটাকে কুশলী শিল্পীর হাতে-আঁকা একখানা নিখুত ছবি বলেই মনে হচ্ছে।

আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল লীলা। অজয় বললে, এত যখন ভাল লাগছে তোমার, তখন বেশ তো, মাঝে মাঝে গ্রামে যাওয়া যাবে। কিছু বন্ধু-বান্ধবও জোগাড় হবে।

লীলা কিন্তু ততক্ষণে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়েছে। অজয় গিয়ে তার পাশে বসতে বসতে বলল, কি হল লীলু, ক্লান্ত নাকি?

না গো, উপভোগ করছি।

তার চেয়ে কাঁধে যখন একবার করেছি তখন এইটুকুও না হয় বয়ে নিয়ে যেতে দাও।

সত্যিই সে তু-হাত দিয়ে শূন্যে তুলে নিল লীলাকে, বুকের ওপর কিছুটা বা চেপেই ধরল।

খুশিতে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল লীলা। বাঁ হাত বাড়িয়ে স্বামীর গলাখানা চেপে ধরে কৃত্রিম কণ্ঠে বলল, এই, কি হচ্ছে দুষ্টু! শিগগির নামিয়ে দাও, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে!

এই মিষ্টি হুকুমটুকু শোনবার কোন আগ্রহ দেখা গেল না অজয়ের।

বাকি পথটুকু সে লীলাকে বয়েই নিয়ে চলল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ভজহরি আর সেই দেহাতী মেয়েটি তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ ভজহরির। বয়সের ভারে একটু বা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মাথার চুলে তুষারমৌলি হিমালয়ের শুভ্রতা। নতুন মনিব আর তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে সে ভিতরে নিয়ে চলল।

সাবেকী আমলের বাড়ি। অসংখ্য বড় বড় ঘর, চওড়া চওড়া বারান্দা। ছাদটা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে।

শ্রান্তি ক্লান্তি যেন ভুলে গেল লীলা। তখুনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে ফেলল। তারপর অজয়কে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থাপত্র করতে লাগল : সকালে কোথায় বসবে, কোথায় খাবে, ঘুমোবেই বা কোন্ ঘরে।

সে রাত্রে খাবার ঘরে বসে মায়া আর সমরের নজরের পড়ল গিরমহলে প্রাণের সাড়া জেগেছে। ঘরে ঘরে আলো সঞ্চারিত ছায়ামূর্তি।

আগন্তুকের খবরটা পাণ্ডের স্ত্রীর কাছ থেকে মায়া আগেই পেয়েছিল। তাই ভেতর ভেতর তার উত্তেজনা আর কৌতুকের অন্ত ছিল না। এক সময় সেটা আর চাপতে না পেরে বলে উঠল, জানেন ডাক্তার রায়, গাঁয়ে যে হৈচৈ পড়ে গেছে!

সমর কোন কথা না বলে প্রসন্ন দৃষ্টিটা শুধু তুলে ধরল। মায়া বলে চলল, পাহাড়ের মাথায় বাড়িটায় লোক এসে গেছে।

কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না সমর। বলল, দেখছি তো!

খোলা জানালার ভেতর দিয়ে মায়া আর একবার গিরমহলের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বাড়িখানা সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে। রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে যেন। স্বতই মায়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ, এই কালো জগতে সব সৎকাজই ঝক্‌ঝক্ করে। পরক্ষণেই মায়ার দিকে ফিরে শ্লেষের সুরে বলল, সত্যি কিন্তু তা করে না মিস দে।

কথাটা গায়ে মাখল না মায়া। নিজের খেয়ালেই বলে চলল,

পাণ্ডের স্ত্রী বলছিলেন, অল্পবয়সী স্বামী স্ত্রী···হয়তো মধুচন্দ্র যাপন করতে এসেছেন। দেখতেও খুব সুন্দর। সর্বাঙ্গে নাকি শহরের ছাপ।

সমর মন্তব্য করল, যেমন গোড়ার দিকে আমাদের ছিল।

মায়া কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল, কি জানি, গাঁয়ের দিকে ওঁরা নামবেন কিনা। আলাপ করা যেত। নতুন মুখ যে কতদিন দেখিনি!

গম্ভীর দৃষ্টিতে সমর কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমার মনে হচ্ছে, এখানে আপনার মন টিঁকছে না। যদি সত্যিই তাই হয়···

কড়া সুরে প্রতিবাদ করল মায়া, না। খুব মন টিঁকছে আমার।

না টেঁকাটা অস্বাভাবিক নয় মিস দে। শহরে মানুষ হয়েছেন আপনি; কাজেই শহরের আলো, শহরের রাস্তা, শহরের ফ্যাশানের জন্য মনটা কেঁদে উঠতে পারে বৈকি!

না, পারে না।

আপনি বলতে চান, এখানে সত্যিই আপনার ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, লাগছে।

চিরকাল থাকতে পারেন?

পারি।

খাওয়া শেষ করে সমর চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল। উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, না, সত্যিই আপনার প্রশংসা করতে হয়। কে জানে, আমাকেই হয়তো এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে!

মায়ার চোখে শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল। প্রায় আর্তনাদের সুরে সে বলল, আপনি···চলে যাবেন এখান থেকে?

মন যদি চায়, যেতে হবে বৈকি! আমার কাছে তো সব জায়গাই সমান। তবু ভারি খুশি হলুম আপনি এখানে থাকতে চান শুনে।

মায়া উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলল, কিসের টোপ গেলাতে চাইছেন?···আপনি জানেন আমি ভালবাসি···

আচমকা থেমে নিজেকে সামলে নিল সে।—আমি ভালবাসি এই গাঁকে, গাঁয়ের লোকদের···কিন্তু এত নিষ্ঠুর আপনি? আপনার কি ক্ষতি

আমি করেছি ? কান্না চাপতে চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতের খাওয়া শেষ করে অজয় আর লীলা বাইরের বারান্দায় বসে ছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে সরকার ভজহরি বলছিল, আজকে বাড়িটার নাম গিরমহল হয়েছে বটে, কিন্তু গোড়াতে এর নাম ছিল 'নিরাময়'।

নিরাময় ? অব্যক্ত কণ্ঠে লীলা বলে উঠল, অদ্ভুত নাম তো! আসলে এটা কি কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল ?

না, মা। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে। প্রথম যিনি এই প্রাসাদ তৈরি করেন, তাঁর সময় থেকেই এই নামটা চলে আসছে। দু'শো বছরের মধ্যে গিরমহল হাত-বদল হয়েছে অনেকবার, কিন্তু সে ইতিহাসটা আজো মরে যায়নি।

অজয় কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করল, ইতিহাসটা জানেন আপনি ?

আজ্ঞে, এখানকার লোক যখন, তখন জানি না বলি কি করে!

লীলা মিনতির সুরে বলল, আমাদের বলুন না সরকার মশাই!

এমন আগ্রহী শ্রোতা ভজহরি বোধ হয় বহুদিন পায়নি। তাই সে পরম উৎসাহে বলতে শুরু করল, বাড়িটা যিনি প্রথম তৈরি করান, তিনি এই তল্লাটে রাজাই ছিলেন বলতে পারেন। তাঁর স্ত্রী রাণীসাহেবা খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। এখানে যখন ওঁরা বাস করতে আসেন তখন সঙ্গে করে রাজাসাহেব তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ছেড়ে একটা দিনও রাজাসাহেব থাকতে পারতেন না। কিন্তু সেই বন্ধু একদিন রাণীসাহেবাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। রাজাসাহেব কিছু বললেন না, কোন হৈচৈও করলেন না। শুধু একলা ঘরে বসে বসে দিনের পর দিন একটা তলোয়ারে সান দিতে লাগলেন —কিসের জন্যে ? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবু, যে, ওঁরা দুজন—বন্ধু আর রাণীসাহেবা ফিরে একদিন আসবেনই।

লম্বা পনেরো বছর পরে বন্ধুটি একলা ফিরে এলেন। রাজাসাহেবকে বললেন, একাই আসতে হল বন্ধু, কারণ তোমার স্ত্রী মারা গেছে। অপরাধী আমি, আমায় শাস্তি দাও। যদি হত্যা করতে চাও,

তাই কর। রাজাসাহেব কিন্তু বন্ধুকে হত্যা করেননি, বরং ভালবেসে ওকেই টেনে নিয়েছিলেন। রাণীর কথা রাজার মনে রইল না। তারপর থেকে বরাবর একসঙ্গে ছিলেন ওই বাড়িতে। মারা যাবার আগে তিনিই বাবু বাড়িখানার নামকরণ করেন 'নিরাময়'।

ভজহরি তার ইতিহাস শেষ করল। অজয় কিন্তু তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। অস্থির চরণে পায়চারি করে এক সময় সরকারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, আপনার ইতিহাসের সঙ্গে বাড়ির 'নিরাময়' নামের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলতে পারেন?

আজ্ঞে না বাবু, তা পারব না। তবে গল্প যেটা চলে আসছে, সেইটাই আপনাদের বললাম।

অকস্মাৎ লীলার হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে অজয় বলল, চল শুয়ে পড়িগে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

সে-রাত্রে কিন্তু মায়াও ঘুমোতে পারছিল না। বালিশে মুখ গুঁজে কোনরকমে কান্না রোধ করছিল।

রাত গভীর। কে জানে হয়তো একটা কি দেড়টা। হঠাৎ দরজায় টুকটুক করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। কতক্ষণ পড়ে রইল কাঁপুনি-ধরা বুকে। তারপর একসময় চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সমর। বাঁ-হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। ডান হাতের তর্জনীটা প্রসারিত করে রেখেছে। কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে ডগা থেকে। প্রথমটা সমর মায়ার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। এমন ভাবে রাতের পোশাকে কোন নারীকে সে বোধ করি দেখেনি। খোলা চুল, শিথিল বসন। পিছনের স্বল্পালোকিত ঘরখানা যেন এক স্বর্গরাজ্যের ইঙ্গিত। মুহূর্তের জন্য বুঝি স্বপ্ন দেখল সমর। এই স্বর্গরাজ্যে নীড় বাঁধা চলে—যে নীড় ভালবাসার উষ্ণতায় ঘেরা। যেখানে দেহ আর আত্মা পরিপূর্ণভাবে সমকামী হতে পারে।

কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ কণ্ঠেই বলল, কিছু মনে করবেন না মিস দে। রাত দুপুরে আপনাকে বিরক্ত করলুম।

আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। আইডিন দিয়ে যদি একটু বেঁধে দেন, ভাল হয়। কারণ নিজে কিছুতেই পারলুম না।

প্রাথমিক চিকিৎসার যা কিছু সরঞ্জাম বাইরের ঘরে থাকে। সেখানে এসে মায়া আঙুলের এই ক্ষতটা পরীক্ষা করল। তারপর তুলো দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি করে কাটল?

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থেকে সমর দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। সেই অবস্থাতেই ছাড়া ছাড়া ভাবে জবাব দিল, কি জানি হয়তো ফ্রয়েড সাহেব বলতে পারেন। ত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কিছু · অন্যমনস্কভাবে আমি অস্ত্রোপচারের ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম উঃ! আস্তে, আস্তে, মিস দে। অতখানি নিষ্ঠুর না-ই বা হলেন···রাতে খেতে বসে আপনার সঙ্গে আমি ব্যবহারটা ভাল করিনি। আপনি তার শোধ তুলবেন না। সত্যিই গিরমহল ছেড়ে যাবার কথা কোনদিন ভাবিনি আমি। আর যদি ভেবেই থাকি, আপনি জানেন, আপনাকে এখানে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না। আজ আমার কাছে আপনি মৌতাতের মত হয়ে উঠেছেন· ·আফিমই বলতে পারেন· ·

মায়ার গালদুটো রক্তাভ হয়ে উঠল। আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গিয়ে হাতটা বোধ করি একটু কেঁপেই উঠল। আরো খানিকটা সে ঝুঁকে পড়ল ধরে-থাকা সমরের হাতখানার ওপর।

গিরমহলের নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎই একদিন ঘূর্ণী দেখা দিল।

অপরাহ্ণ। সূর্য পাটে বসেছে। বাড়ির পশ্চিম দিকের ছাদে অজয় আর লীলা হাত ধরাধরি করে পায়চারি করছিল। জীবন-প্রাচুর্যে ভরা দুটি শিশু যেন।

ছাদের একটু নিচুতে পাহাড়ের দিকে খোলা ঝুল-বারান্দা একটা ছিল। ফুট তিরিশেক নিচে পাহাড়েরই একটা অংশ যেন গা এলিয়ে রয়েছে। ছড়ানো পা-টা নেমে গেছে অনেক নিচে সমতল জমির ওপর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঝুল-বারান্দাটা অনেক উঁচু থেকে উদ্ধত দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে নগণ্য গ্রামখানার দিকে।

বেড়াতে বেড়াতে অজয় আর লীলা ঝুল-বারান্দাটার কিনারে এসে পৌঁছল। দেখল দুটো চড়ুই পাখি আলসের ওপর বসে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় ডানা মেলে দিয়েছে।

বড় কাছাকাছি বসে ছিল তারা। জীবন সম্বন্ধে যেন নিস্পৃহ! তবু মানুষের আবির্ভাব তারা সহ্য করতে পারল না। কিচমিচ করে বোধ করি প্রতিবাদ জানিয়ে উড়ে পালাল।

অজয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে লীলা বললে, দেখলে?

অজয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। বিশেষ করে দেখবার মত কিছুই তার নজরে পড়েনি।

লীলা বলল দুটো পাখিই পুরুষ।

কথাটা সত্যি। কারণ দুটো পাখিরই পালকে গাঢ় কালো এবং বাদামী রংয়ের খেলা—যেটা পুরুষ পাখিরই নিশ্চিত অভিজ্ঞান।

অজয়ের বুকের মধ্যে বিচিত্র এক অনুভূতি দেখা দিল। তার মনে পড়ে গেল গিরমহলের ইতিহাসের কথাটা।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল।

সারা দৃশ্যপটেরই রূপান্তর ঘটল।

অদ্ভুত মনে হচ্ছিল ঝুল-বারান্দাটাকে। ওরা লোভ সামলাতে পারল না। সিঁড়ি বেয়ে ঝুল-বারান্দায় নেমে এল। মুগ্ধ লীলা নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছ! গ্রাম-খানাকে এত কাছে মনে হচ্ছে, যেন এখান থেকে ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়। অজয় সস্মিত মুখে বলল, এত যখন ইচ্ছে, তখন গাঁয়ে একবার বেড়িয়ে আসতে পারো। বাড়ি থেকে কতটুকুই বা পথ! হয়তো প্রথমেই দেখা হয়ে যাবে গাঁয়ের ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।

হেসে উঠল সে। একটু বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পা বেধে গেল আলসেয়; টাল সামলাতে পারল না। লীলা আর্তধ্বনি করে ছুটে আসবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে—অনেক নিচে।

লীলার আর্তধ্বনি আর একবার সারা বাড়িখানাকে উচ্চকিত করে

তুলল। ছুটে গিয়ে সে আলসের কিনারায় ঝুঁকে পড়ল। দেখল, ফুট তিরিশেক নিচে অজয়ের নিস্পন্দ দেহটা পড়ে আছে।

কি ভাবে কোথা দিয়ে সে নিচে নেমে এল, নিজেই জানে না। স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখল, তার প্রাণটুকুই আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই। মাথার পেছন দিকটা রক্তে মাখামাখি।

একা সে। সরকার ভজহরি কোথায় বেরিয়েছে যেন। দেহাতী ঠিকে-ঝিটিও তার দিনের কাজ শেষ করে একটু আগেই নিজের ঘরে চলে গেছে।

উপায় নেই। এখানে এভাবে লীলা স্বামীকে মরতে দিতে পারে না। প্রাণপণ চেষ্টায় সে অজয়ের নিস্পন্দ দেহটা দু-হাতে টেনে তুলল। তারপর একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল ছাদের ওপর। অমানুষিক পরিশ্রমে কপাল দিয়ে তার স্বেদধারা ঝরে পড়ল। বুকের ভেতরটায় যেন হাপর টানার মতই হাঁফ। নিজেকে আর সে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না, লুটিয়ে পড়ল সে অজয়ের অচৈতন্য দেহটার পাশে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায় যেন এক দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। তারপর কোনরকমে টানতে টানতে অজয়কে এনে যখন তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল, বাইরে তখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

একসময় বাইরে পায়ের শব্দ পেতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সামনে ভজহরিকে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, ডাক্তার—একজন ডাক্তার ভজহরিবাবু—গাঁ থেকে একজন ডাক্তার এখুনি ডেকে আনুন। যেমন করে পারেন যে করেই হোক!

ভজহরি প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে গেল। পরে দুর্ঘটনার বিবরণটুকু শুনে বলল, কিন্তু মা, আমি গেলে এই রাত্রে হয়তো ডাক্তার আসবে না। তাছাড়া অন্ধকারে আমার ভাল ঠাহরও হয় না চোখে।

তাহলে আমি নিজেই যাব।—লীলা ব্যগ্রভাবে ভজহরির হাত দুটো চেপে ধরে বলল, আপনি একটু ওঁর কাছে থাকুন। আমাকে যেতে দিন। এভাবে একলা ফেলে রেখে তো আমি যেতে পারি না।

উদ্‌গত বাষ্পটি চাপতে চাপতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ঘরে বসে সমর তখন মাসকাবারী খরচের হিসেব করছে। সামনে বসে মায়া ফর্দ দেখে তারিখ মিলিয়ে বলে বলে যাচ্ছে, চাল— লিখেছেন? তেরো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। আর ঘি দু-কিলো তেরো টাকা হিসেবে ছাব্বিশ টাকা। নিন, যোগ করুন।

যোগটা সমর করল ঠিকই, কিন্তু মোট অঙ্কটা যা দাঁড়াল, সেটা দেখেই তার চোখে একটা কালো ছায়া নেমে এল। ম্লানভাবে হেসে বলল, সাতাত্তর টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা। হুঁ,…এ-মাসে মোট কত উপায় করেছি জানেন মিস দে?

মায়া নিরীহের ভঙ্গীতে জবাব দিল, জানি ডাক্তার রায়, সাত টাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

হেসে উঠল সমর। তার মানে হচ্ছে, ঘাটতি সত্তর টাকা চব্বিশ…

শুকনো ঠোঁট দুটো সে একবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, মনে হচ্ছে, এখানে সুবিধে হবে না মিস দে। পুঁজিপাটা তো শেষ। সামনের মাসে যদি মোটামুটি উপায় না করতে পারি, তাহলে এই গাঁ ছাড়তে হবে।

কথাশেষে একবার তির্যক দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকাল। বোধ করি তার প্রতিক্রিয়াটা একবার দেখতে। কিন্তু এ ভীতি-প্রদর্শনে মায়ার মুখে কোন রেখাপাত ঘটল না। শান্তমুখেই সে কাগজ-পত্রগুলো গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, এবার খাবেন কি?

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেজানো বাইরের দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন লীলাকে নিয়ে পাণ্ডে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই গিরমহল থেকে এই লেডী আপনার কাছে এসেছেন ডাক্তার সাহেব।

লীলা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সমরকে চিনতে পেরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সমরবাবু, আপনি?

সমর প্রথমটা তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। পারল যখন, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পাংশু মুখখানার ওপর যথাসাধ্য পর্দা টেনে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, বসুন, মিসেস সেন।

পাণ্ডে বোধ করি ইত্যবসরে অনেক কিছুই আন্দাজ করে নিল। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দ পায়ে সে বেরিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। মায়া ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল—দারুমূর্তির মতই।

লীলা কিন্তু বসল না। টেবিলের কিনারাটা চেপে ধরে আতঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমরের মুখের দিকে।

সমর নিরুত্তাপ গলায় বলল, কিসের জন্য পদার্পণ ঘটল আমার এখানে জানতে পারি কি?

লীলা জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো বারকয়েক ভিজিয়ে নিল। ভগ্ন কণ্ঠে ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, সমরবাবু···আমার স্বামী···মস্ত দুর্ঘটনা··· ছাদ থেকে নিচে পাহাড়ে পড়ে গেছেন···অজ্ঞান হয়ে আছেন··· একবার এখুনি যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর সমর পেশাদারী গলায় বলল, আঘাতটা কোথায় পেয়েছেন?

মাথার পেছন দিকে···মনে হচ্ছে খুবই গুরুতর···অন্তত তিরিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়েছেন···

সমরের চোখ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, আপনি কি আমাকে কেসটা হাতে নিতে বলছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাক্তার রায়। আসুন আপনি। যত দেরি হবে ততই···

সমর উঠে দাঁড়াল। সেই পেশাদারী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, যাব বৈকি। আমি ডাক্তার, যেতে তো হবেই।

লীলা আর দাঁড়াতে পারছিল না। পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। অবস্থা দেখে দ্রুত আসছিল সমর সাহায্য করবার জন্যে; কিন্তু তার আগেই লীলা আবার উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে। দয়া করে চলুন, দেরি করবেন না।

এবার সমর রূপান্তরিত হল পুরোদস্তুর চিকিৎসকে। গম্ভীর ভাবে বলল, না, আমি তৈরি···মায়া···মিস দে···আমার সার্জারি ব্যাগটা নিয়ে আসুন। আর যা কিছু দরকার একটা স্যুটকেশে ভরে নিন।··· কিন্তু মিসেস সেন, একজন নার্সেরও যে দরকার হবে?

নিশ্চয়ই, এ আর বলবার কি আছে !

তবে তুমিও তৈরি হয়ে নাও মায়া, যেতে হবে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মায়া নিজে তো তৈরি হয়ে নিলই, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিল একটা স্যুটকেশে। চোখ দুটোয় তখন তার এক বিচিত্র আলো ঝকঝক করছে। জীবনে এই প্রথম তাকে সমর নাম ধরে ডেকেছে, 'তুমি' সম্বোধন করেছে।

স্যুটকেশটা মায়ার হাত থেকে নিয়ে সমর লীলার উদ্দেশে বলল, চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক মিসেস সেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে সমর অজয়কে পরীক্ষা করল। মুখ তার ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠল। একসময় আচমকাই উঠে দাঁড়িয়ে সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লীলা তাকে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল সেখানে। কতক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। শুধু নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে সমর মুখোশের মতই মুখে জানাল, জীবনের খুব বেশি আশা নেই। মাথার খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

রক্তহীন বিবর্ণ লীলা আর্তনাদ করে উঠল, কোন আশা নেই !

খুব অল্পই। এভাবে পড়ে থাকলে বড়জোর আর বারো ঘণ্টা বাঁচতে পারে। তবে অপারেশন করতে পারলে…

বেঁচে যাবেন ?

একটু আশা করা যায়, যদিও খুব ক্ষীণ। খুলির হাড়গুলো বার করে নিয়ে আবার বসাতে হবে।

এখানে তার অসম্ভাব্যতা বুঝেই লীলা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, অপারেশন না করতে পারলে বাঁচবার কোন আশা নেই বলছেন ?

মনে হয় তাই।

তাহলে আপনিই করুন না কেন ?

সমরের মুখে কোন রেখাপাত ঘটল না। ধীর কণ্ঠে সে বলল, অতখানি ঝুঁকি কাঁধে নেবার মত সাহস আমার নেই।

কি—কি বলতে চান ?

অপারেশন যদি করতেই হয়, তাহলে স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়া হিসাবে আপনাকে লিখে দিতে হবে যে, আপনার বিশেষ অনুরোধেই আমি অপারেশন করছি। অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যে জীবনহানির আশঙ্কা আছে, সেটা জেনে শুনে অনুরোধ করছেন আমায়—এটাও লেখা থাকবে।

লীলা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের ভেতর কি চিন্তা ক্রিয়া করে চলেছে, সেটাই পড়তে চায়। কিন্তু না, সমরের মুখ অপাঠ্য। অবসন্ন দেহে সে পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। তারপর উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতেই লিখতে শুরু করল আমমোক্তারখানা।

সমর তার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তারপর সেখানা ভরে রাখল প্যাণ্টের পকেটের ভেতর। তারপর লীলার দিকে যখন সে আবার ফিরে তাকাল, তখন তার চোখে ফুটে উঠেছে বিজয়ীর দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

কিন্তু কতক্ষণই বা! শল্যচিকিৎসা বিশারদে রূপান্তরিত হতে তার বিলম্ব ঘটল না। কণ্ঠে ফুটে উঠল পেশাদার সুলভ গাম্ভীর্য: একটা টেবিলের দরকার···হ্যাঁ, এটাতেও কাজ চলতে পারে···গরম জল চাই ···খুব বেশি করে···আপনাদের সরকার মশাই বোধ হয় সেটা করতে পারবেন···মোমবাতি আছে? মোমবাতি—অন্তত গোটা পঞ্চাশেক। পাশের ঘরে মায়ার উদ্দেশে হেঁকে বলল, মিস দে, তাড়াতাড়ি সব কিছু রেডি করে ফেলুন।

সেখান থেকে মায়া জবাব দিল, আমি তৈরি আছি ডাক্তার রায়।

নিন মিসেস সেন, এবার টেবিলটা ধরুন দিকিনি, এটা ওঘরে নিয়ে যেতে হবে।

গায়ের কোটটা খুলে সে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ভাল করে মুছতে লাগল টেবিলটা। লীলা কোমর বেঁধে নিল তাকে সাহায্য করতে।

ঘরের চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় মোমবাতি জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘরখানা। না, তাতে অস্ত্রোপচারের বিশেষ কোন অসুবিধে ঘটবে না। ধরাধরি করে অজয়কে টেবিলের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথার চুলগুলো। মাথার যেসব জায়গায় চামড়াগুলো ফেটে ফেটে গেছিল, সেগুলোয় তখন দলা দলা রক্ত।

পাশে আর এক টেবিলের ওপর অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম রাখা। পাশে দাঁড়িয়ে মায়া। ওপাশে লীলা দু-হাত বুকে চেপে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে। আর টেবিলের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে ভজহরি গরম জলের পাত্র হাতে। বিশেষ একটি ছুরিকা হাতে তুলে নিয়ে সমর লীলার দিকে তাকাল। মুখখানা তার কঠিন—ভয়াল।

লীলা শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিতেই সমর হুকুমের সুরে বলল, না, আপনার এখানে দাঁড়িয়ে না থাকাই ভাল।

পাশের ঘরে এসে লীলা একখানা চেয়ারের ওপর অবসন্ন দেহে বসে পড়ল। চিন্তাসূত্রগুলো জট পাকিয়ে গেছে মাথার ভেতর। চোখের দৃষ্টি শূন্য।

এক কোণে টেবিল-ল্যাম্প একটা জ্বলছিল। হঠাৎ তার মনে হল সাদা দেয়ালের ওপর দুটি দেবদূতী ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। শিউরে উঠে সে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

কতক্ষণ পরে আবার যখন মুখ তুলল, দেখল, ডানা মেলে দুটো পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতিদানটার আলোক-শিখায়। মনে পড়ে গেল তার বাড়ির ইতিহাসটার কথা। দুটো পতঙ্গ যেন সেই দুই অশরীরী বন্ধু। ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে।

বিভীষিকাময়ী রাত্রিও এক সময় শেষ হল। দেখা দিল দিনের আলো। যেন নতুন প্রাণের সাড়া। অজয় বিছানায় শুয়ে ছিল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। গয়ে সাদা চাদর একখানা গলা পর্যন্ত টানা। জ্ঞান তখনও তার পুরোপুরি ফিরে আসেনি। তাই সমর বিছানার পাশেই একখানা চেয়ারে বসে পরম আগ্রহে তাকিয়ে ছিল বন্ধুর মুখের দিকে।

লীলা শক্ত মুঠিতে কাঠের বাজুটা চেপে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা আর বুঝি সে সহ্য করতে পারে না। দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসে। পাশের ঘর থেকে দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু টক্‌টক করে আওয়াজ করেই যেতে লাগল।

অকস্মাৎ অজয়ের চোখের পাতা দুটো একটু একটু কেঁপে উঠতেই সমর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, এবার বোধ হয় জ্ঞান ফিরবে।

লীলা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্বামীর মুখের ওপর।

সত্যিই অজয়ের জ্ঞান ফিরে এল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা ফেলল সে। দৃষ্টটা গিয়ে আটকে গেল সমরের মুখের ওপর। মৃদু অথচ জড়তাহীন কণ্ঠে সে বলল, কি রে সমর, স্বপ্নে আমি তোকেই দেখছিলুম!

সমর খুশি হল। মুখে তার জ্বলে উঠল হাজার-বাতির আলো। বন্ধুর হাত একখানা চেপে ধরে বলল, অজয়কেও জয় করেছি তাহলে! লক্ষ্মী ছেলের মতন আবার ঘুমিয়ে পড় দিকিন। তারপর যত ইচ্ছে স্বপ্ন দেখ!

বন্ধুর নির্দেশ অমান্য করতে পারল না অজয়। হাসিভরা মুখেই আবার চোখ বুজে ফেলল।

তখন অজয় নিদ্রিত। স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে সমর উঠে দাঁড়াল। চুপি চুপি মায়াকে বলল, চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

প্রায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এই সময় ছুটতে ছুটতে লীলা এসে ঘরে ঢুকল। সে যে চলে যাচ্ছে, বুঝেই একখানা হাত চেপে ধরল তার। কিন্তু কি যে বলবে, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে নীরবে তাকিয়ে রইল।

সমরের চোখে ফুটে উঠল কঠিন-শীতল দৃষ্টি। এক মুহূর্ত সেটা বদ্ধ হয়ে রইল লীলার মুখের ওপর। পরমুহূর্তে পুরুষ কণ্ঠে বলল, আচ্ছা, নমস্কার।—তারপরই মায়ার একখানা হাত চেপে ধরে তাকে একরকম টানতে টানতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে নামছিল তারা। সমর কি ভাবছিল কে জানে, অকস্মাৎ এক সময় সে হো হো করে হেসে উঠল। মায়া চলছিল পাশে পাশে, যদিও এখন আর হাতে হাত ধরা নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে তাকাল সঙ্গীর মুখের দিকে।

সমর কৌতুকের সুরে বলল, বড় বিচিত্র এই জগৎ, বুঝলেন মিস দে? ওই ভদ্রমহিলাটিকে, আপনি হয়তো জানেন না, আমি একদিন ভালবেসেছিলাম। আর আমার বন্ধুটি ওকে আমার কাছ থেকে অপহরণ—হ্যাঁ, অপহরণই করেছিল।

মায়া কোন জবাব দিল না। তবে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে কি যেন একটা কৌতুক উপভোগ করছিল।

সমর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জবাব দিচ্ছেন না যে?

আমি ভাবছি।

ভাবছেন? কি?

এমন কিছু নয়—এই এলোমেলো!

সমর চটে উঠল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এলোমেলো নয়। আমি জানি আপনি ভাবছেন, আমি কেন বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুললুম। মেরে ফেলাটা অবশ্য কিছুই কঠিন ছিল না। মস্তিষ্কের 'মেডালায়' ছোট্ট একটি খোঁচা আর তাতেই···

আপনি সেটা করতে পারতেন না ডাক্তার রায়।

পারতাম না? কিসে বুঝলেন?

মায়া হেসে ফেলল। আর ফেলেই মুখখানা ঘুরিয়ে নিল তার দিক থেকে।

এতে সমর আরো চটল। তীব্র কণ্ঠে বলল, হাসছেন কেন?

কই, না তো!

নিশ্চয়ই হাসছেন। হুঁঃ! কোন স্ত্রীলোকই সোজাসুজি কথা বলতে জানে না। কিছু টিপে কিছু ঘুরিয়ে···আপনি কি বলতে চান, লীলাকে আমি কোনদিন সত্যকার ভালবাসিনি?

না, না ডাক্তার রায়, এমন কথা আমি বলতেই পারি না। তবে—। একটু থেমে সে ভীরু কণ্ঠে বলল, তবে অজয়বাবুকেও তো আপনি ভালবাসেন ?

সমর রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, বাসতুম। ওকে ভাবতুম, জগতের একমাত্র বন্ধু। কিন্তু সে-সব অনেকদিন চুকে গেছে, মন থেকে মুছে ফেলেছি সব, বুঝলেন ?

মায়া নিরীহের ভঙ্গিতে বলল, আপনি যখন বললেন, তখন মেনেই নিচ্ছি।

সমর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল, দাঁত কড়মড় করে বোধ করি দুনিয়ার স্ত্রীজাতটাকেই মনে মনে অভিসম্পাত দিল।

আরো দিন পনেরো কেটে গেছে। অজয় অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন সে বিছানায় উঠে বসে কথাবার্তাও বলে। সমর দিনে দুবার তাকে দেখতে আসে। অবশ্য একান্তভাবে চিকিৎসক হিসেবে। অজয় যদি কখনো ঘনিষ্ঠভাবে পুরোন দিনের প্রসঙ্গ তোলে, সমর ধীর শান্তভাবে বন্ধুকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

সেদিনও সে এসেছিল। খাটের ওপর বসে ছিল অজয়। মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে লীলা! সে গম্ভীর ভাবে বলল, আমার দেখতে আসার আর কোন দরকার নেই। ইচ্ছে হলে আপনারা ফিরে যেতে পারেন।

সে উঠে দাঁড়াল। অজয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, লীলা, তুমি একটু পাশের ঘরে যাবে ? আমি সমরকে গোটা-কয়েক কথা বলব।

লীলা নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অজয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, সমর আয়, এখানে এসে বোস।

বিছানার পাশের চেয়ারটা সে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল। সমর কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। অজয় মৃদু হেসে বলল, এতখানি দুর্বল না হয়ে পড়লে ঘাড় ধরে তোকে ওখানে বসিয়ে দিতুম।

সমর কোন কথা না বলে পাশের চেয়ারখানায় এসে বসল। তার কাঁধে একখানা হাত রেখে অজয় গাঢ় কণ্ঠে বলল, আমি অপরাধী, তা জানি রে সমর। তোর সঙ্গে ছল-চাতুরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না, সোজাসুজিই তোকে খুলে বলতে পারতুম। কিন্তু বিশ্বাস কর, তুই যে লীলাকে ভালবাসিস, আমি আগে তা জানতুম না। পারবি বিশ্বাস করতে ?

সমর কোন জবাব দিল না। বুকের ভেতর একটা বাষ্প যেন তার ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইল।

অজয় বলে চলল, লীলাকে আমি ভালবেসেছিলুম—পাগলের মত ভালবেসেছিলুম। আর কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাইনি। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম তুই তাকে চাস, তাহলে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার আগে নিজের জিভটা উপ্‌ড়ে ফেলতুম।

সমর কি যেন ভাবছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি জানি অজয় —অন্তত বোঝা উচিত ছিল।

অজয় বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে উৎসাহ ভরে বলে উঠল, বল তাহলে, আজও আমরা সেই বন্ধুই আছি—যেমন আগে ছিলাম ?

সমর বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল। তখন আর তার সেই অন্যমনস্কতাটা নেই। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল অমলিন হাসি। অজয়ের একখানা হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, ভুল আমিই করেছি রে। কিন্তু উনি করেননি, ঠিকই বুঝেছিল।

উনি ? মানে লীলা ?

সমর শুধু আর-একদফা হাসল। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কবে নাগাদ যেতে চাস তাহলে ?

তোদের ওপরই তো সেটা নির্ভর করছে। তোর আর লীলার।

তাহলে ওঁর ওপরই ছেড়ে দে। আচ্ছা—উঠে দাঁড়াল সমর।

অজয় ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, তুই কি এখানেই থাকতে চাস ?

হ্যাঁ। আচ্ছা, আজ চলি। আর দেরি করব না, হঠাৎ এক জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল। যাবার জন্যে সে পা বাড়াল।

অজয় ডাকল, সমর শোন—

সমর ফিরে তাকাল। অজয় মিনতি করুণ কণ্ঠে বলল, লীলুর সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে নিবি না? ওকে ভালবাসাটা যে কি, সেটা আমি বুঝি রে! যদি বিদায় নিতে গিয়ে একবার ওকে বুকেও টেনে নিস, আমি কিছু মনে করব না।

বা! স্বামী হিসেবে আদর্শ তুই! হা হা করে হেসে উঠল সমর। পরক্ষণে হেঁট হয়ে চুপি চুপি বন্ধুর কানে কানে বলল, আমি আর একজনকে বুকে টেনে নিতে চাইরে! যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল। এখন যাচ্ছি আবার বিকেলে দেখা হবে।

ঘূর্ণী হাওয়ার মতই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর অজয় তাকিয়ে রইল বন্ধুর গমনপথের দিকে।

এ ক'টা দিন মায়া অনেক ব্যথাই পেয়েছে। অকারণেই যেন সমর বার বার রূঢ় হয়ে উঠেছে তার ওপর। আর বুঝি সে সহ্য করতে পারে না। তাই মনে মনে সে স্থির করেছিল ভাগ্যের পাশা নিয়ে শেষবারের মন সে খেলতে বসবে। যদি দান দিতে ভুল হয়, জীবনে আশা করার মত আর কিছু থাকবে না। কিন্তু যদি সে ভুল না করে—

সমর এসে ঘরে ঢুকল। দেখল মায়ার জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা। বড় স্যুটকেশটার ওপর সে বসে।

ধীর পায়ে মায়া উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা হয়তো সে বলতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। শুধু ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠল।

অসহ্য বিস্ময়ে সমর বলে উঠল, কি ব্যাপার? হঠাৎ—

আমি চলে যাচ্ছি, ডাক্তার রায়।

চলে যাচ্ছেন? সমরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল, কেন? কোথায়?

হাতব্যাগটা তুলে নিতে নিতে মায়া ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, শহরে। এক বন্ধু চিঠি লিখেছে। হয়তো হাসপাতালের চাকরিটা পেতে পারি।

কথাশেষে একখানা খাম সে সমরের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

খামে লেখা নামটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, সমর সেখানা প্রায় ছিনিয়ে নিল মায়ার হাত থেকে। তারপর সেখানা পকেটে ভরতে ভরতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে, চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি আপনারই মত একটি মেয়ে—পুরুষ নন। আসুন না এদিকে—

মায়া ধীর পদে এগিয়ে এল। মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে। যেন এখুনি একটা কলহের ঝড় উঠবে। মায়ার চোখে উদ্ধত দৃষ্টি।

দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না সমর। কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমায় রেঁধে দেবে কে, খাওয়াবে কে, সেবা যত্ন করবে কে ?

মায়া ঢোক গিলল। সমরের যে দৃষ্টিতে ছিল বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ, তাতেই ফুটে উঠল হাসির রূপালি রেখা। তার প্রতিক্রিয়া বুঝি দেখা দিল মায়ার মুখেও। সে হেসে ফেলল।

সমর অকস্মাৎ দু-হাত বাড়িয়ে তাকে শূন্যে তুলে নিল, তারপর মুখখানা নামিয়ে আনল নিজের মুখের ওপর। অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগল বারবার, চলে যাবে ? যাও তো !

মায়ার একখানা হাত স্বতই উঠে এসে সমরের কণ্ঠ বেষ্টন করল।

সমর তাকে নিয়ে কি ভাবে যে আদর করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার বুকে মুখ গুঁজে ছেলেমানুষের মত বলে চলল, লীলাকে আমি সত্যিকার ভাল কোনদিনই বাসিনি—আমার সব ভালবাসা ছিল অজয়ের ওপর, তাই আমি ভুল বুঝে তার ওপর রাগ করেছিলুম, ভেবেছিলুম ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই আমার মন ভেঙে গিয়েছিল।

বিচিত্র এক মোহময় আনন্দে মায়ার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসছিল। কাঁপা গলায় সে বলল, কিন্তু তোমাদের মধ্যে আমার ঠাঁই কোথায় ?

তোমার ঠাঁই এই অন্তরে—যেখানে তুমি একমাত্র সাম্রাজ্ঞী।

আর একবার সে তার মুখখানা নামিয়ে আনল মায়ার মুখের

ওপর। ঠিক সেই সময় বাইরের কড়া নড়ে উঠল। ভেসে এল পাণ্ডে সাহেবের গলা: ডাংদার সাব!

মায়াকে বাহুবেষ্টনে বেঁধেই সমর ছুটতে ছুটতে গিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকল।

সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন পাণ্ডে। বললেন, একটা মেটারনিটি কেস—

কিন্তু ঘরে কাউকে না দেখে মাঝপথেই তিনি থেমে গেলেন। একজন দেহাতী লোক সঙ্কুচিত পায়ে তাঁর পেছন পেছন ঘরে এসে দাঁড়াল।

সমর তখন পেছনের ঘরে মায়ার কানে বলছে, তোমাকে যে ভালবাসি, সেটা টের পেয়েছিলুম কবে জান মায়া? যেদিন কলকাতায় নিজের চেম্বারে ফিরে এসে তোমাকে দেখেছিলুম ঠিক এমনিভাবেই নিজের স্যুটকেশের ওপর চুপচাপ বসে থাকতে।

কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে পাণ্ডে তখন দেহাতী লোকটিকে বলছেন, আশ্চর্য। পাঁচ মিনিটও হয়নি, ডাংদার সাবকে আমি কোঠিতে ঢুকতে দেখিয়েসি—। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি এবার উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, ডাংদার সাব।

হয়তো ভেতরের ঘরের দিকেই এগিয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু মেঝেয় পড়ে থাকা স্যুটকেশটায় হোঁচট খেলেন।

সমর তখন মায়ার হাত ধরে টানতে টানতে পেছনের দরজা দিয়ে এককফালি বারান্দাটায় এসে পড়েছে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়াকে সে বললে, তোমাকে বলতেই হবে—বল আমাকে কখন ভালবেসেছিলে?

মায়া সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিল, যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলুম, সেই হাসপাতালে।

মুখ দিয়ে একটা চিৎকার ধ্বনি করেই সমর তাকে বুকে টেনে নিল। আবার মুখের ওপর মুখ।

দূর থেকে তখন পাণ্ডের ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসছে: ডাংদার সাব! কোথায় আপনারা?

চোখ বন্ধ করে সমর ধ্যানমগ্নের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, স্বর্গে!